কিশোর কাহিনী সিরিজ
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি

মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ: দেবশিস দেব

‘রা-স্বা’
অজন্তা, অবন্তী, মধুমিতা, অমিত ও স্বপ্ননীলকে
বড়মামা

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার
অষ্টপুরের বৃত্তান্ত
উঁহু
কিশোর উপন্যাস সমগ্র (১-৪)
কুঞ্জপুকুরের কাণ্ড
গজাননের কৌটো
গোঁসাই বাগানের ভূত
গোলমেলে লোক
গৌরের কবচ
চক্রপুরের চক্করে
ছায়াময়
জং বাহাদুর সিংহর নাতি
ঝিকরগাছায় ঝঞ্ঝাট
ঝিলের ধারে বাড়ি
ডাকাতের ভাইপো
দশটি কিশোর উপন্যাস
দুধসায়রের দ্বীপ
নন্দীবাড়ির শাঁখ
নবাবগঞ্জের আগন্তুক
নবীগঞ্জের দৈত্য
নৃসিংহ রহস্য
পটাশগড়ের জঙ্গলে
পাগলা-সাহেবের কবর
পাতালঘর
বক্সার রতন
বটুকবুড়োর চশমা
বনি
বিপিনবাবুর বিপদ
ভুতুড়ে ঘড়ি
ভোলু যখন রাজা হল
মদন তপাদারের বাক্স
মোহনরায়ের বাঁশি
রাঘববাবুর বাড়ি
যোলো নম্বর ফটিক ঘোষ
সর্বনেশে ভুল অঙ্ক
সাধুবাবার লাঠি
সোনার মেডেল
হাবু ভুঁইমালির পুতুল
হিরের আংটি
হেতমগড়ের গুপ্তধন

এই উপন্যাসের শেষ দিকে একটা দৃশ্য আছে, যেখানে
ভজবাবু ডাকাতের দল নিয়ে রাজবাড়ি লুট করতে যাচ্ছেন,
সেই দৃশ্যে ভজবাবুর মুখে কিছু গান রয়েছে। এই গানগুলি
লিখে দিয়েছেন বিখ্যাত কবি শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

ফটোটা কী করে যে মনোজদের বাসায় এল, তা কেউ জানে না। ফটোটা কার, তাও কেউ বলতে পারে না। মনোজদের বাড়িতে অনেকের ফটোর মধ্যে এই ফটোটাও বরাবর আছে। অথচ কেউ ঠিক করে বলতে পারে না যে, এটা কোত্থেকে কবে এসেছিল, ফটোর ছেলেটাই বা কে!

ফটোটা একটা ছেলের। তার বয়স হবে আট নয় বা দশ। একটা বাংলো-বাড়ির সামনের বারান্দার সিঁড়িতে সে বসে আছে। সামনের বাগান থেকে বারান্দায় উঠতে মোট তিন ধাপ সিঁড়ি। ঠিক মাঝের ধাপে ছেলেটা বসে আছে, নীচের সিঁড়িতে পা, ওপরের সিঁড়িতে কনুই রেখে সে একটু পিছনে হেলে বসে আছে। তার পায়ে বুটজুতো আর মোজা, সাদা হাফপ্যান্ট, গায়ে ফুলহাতা সোয়েটার, আর সোয়েটারের গলার কাছে সাদা শার্টের কলার বেরিয়ে আছে। ছেলেটা দেখতে ভীষণ সুন্দর! বড় বড় চোখ, লম্বাটে মুখ, চোখা পাতলা নাক, গালগুলো ভরাট, কিন্তু লুচির মতো ফোলা ফোলা নয়। তার চুলে ডানদিকে সিঁথি, আর কপালটার অনেকখানি ঢেকে চুলগুলো পাট করা। ছেলেটা অল্প একটু হাসিমুখে চেয়ে আছে। সেই হাসি আর তাকানো এত জীবন্ত যে, যে-কোনও সময়ে ছেলেটা যনে কথা বলে উঠবে। ছবিটার মধ্যে আরও দুটো অদ্ভুত ব্যাপার আছে। ছেলেটার পিছনে যে বারান্দা, তাতে টেরছা হয়ে রোদ পড়েছে। বারান্দার পিছনে দরজা, দরজায় একটা গোলাপ ফুলের ছাপওলা পর্দা ঝুলছে। সামনে রোদ, কিন্তু পদার্টা ছায়ায়, তাই পর্দার গায়ে গোলাপের ছাপ একটু অস্পষ্ট। আর সেই পর্দাটা একটুখানি সরিয়ে একটা মুখ উঁকি মেরে আছে। মুখটা খুবই অস্পষ্ট । শুধু সেই মুখে একটু হাসি বোঝা যায়। যনে কেউ হাসিমুখে ছেলেটার ছবি-তোলানো দেখছে। কিন্তু সেই মুখটা ছেলের না মেয়ের, তা বোঝা যায় না। আরও একটা মজার ব্যাপার হল, ছেলেটার বাঁ দিকে একটা কাচের গেলাসে তিন পোয়া ভর্তি দুধ রয়েছে। দুধ কিনা তা ঠিক করে বলা যায় না, তবে সাদামতো তরলটা দুধ ছাড়া আর কীই বা হবে। আর সেই প্রায় পৌনে এক গেলাস দুধে মুখ ডুবিয়ে দুধটা খেয়ে নিচ্ছে একটা বেশ বড়সড় মোটা বেড়াল । বেড়ালটার লেজও খুব মোটা। বোঝা যায়, ছেলেটা দুধ খাচ্ছিল, সেই সময়ে ফটো তোলাতে গিয়ে গেলাসটা পাশে রেখেছিল, আর তখন ছেলেটাকে অন্যমনস্ক দেখে বেড়ালটা চুপিচুপি এসে চুরি করে দুধ খেয়ে নিচ্ছে। ছেলেটা টের পায়নি। ছবিটার মধ্যে আরও কিছু কিছু জিনিস লক্ষ করা যায়। যেমন, বারান্দার নীচে বাগানের একটু অংশ ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বাগানে অনেক গাঁদা, ক্রিসেনথিমাম, পপি ফুল ফুটেছে। বাংলো-বাড়িটার

টিনের চাল। বারান্দার ওপরে টিনের চালটার একটু ঢালু অংশ দেখা যায়। বারান্দার থাম বেয়ে একটা লতানে গাছ উঠেছে চালে।

মনোজ যে কতবার ছবিটা দেখেছে তার হিসেব নেই। ছবিটা দেখতে তার বড় ভাল লাগে। কনে ভাল লাগে তাও সে জানে না। যদি কখনও তার মন খারাপ হয়, বা কখনও কারও সঙ্গে ঝগড়া হয়, বা মায়ের ওপর অভিমান হয়, তখন সে এসে একা ঘরে ছবিটা বের করে চেয়ে বসে থাকে। ছবি থেকে ছেলেটাও তার দিকে হাসিমুখে চেয়ে থাকে। তখন মনোজের মনের মধ্যে কী যনে হয়, সে ভাবে—এই তো আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু। তখন তার মন ভাল হয়ে যায়। মনোজ খুব ছেলেবেলা থেকেই তাদের বাড়িতে ছবিটা দেখে এসেছে। আর ছবিটা বেশ পুরনো, একটু হলদে-হলদে পুরনো ছাপও পড়ে গেছে তাতে। অর্থাৎ ছবিটা অনেক আগে তোলা হয়েছিল, এবং ছবির ছেলেটা নিশ্চয়ই এখন আর ছোট নেই। সে হয়তো অনেক বড় হয়ে এখন মনোজের কাকা বা বাবার মতো বড় মানুষ হয়ে গেছে। তবু ছবির ছেলেটাকে মনোজ বন্ধু বলেই ভাবে। ভাবতে ভাল লাগে। এই ছবিটার কোনও ঠিকানা নেই, কোথায় করে তোলা হয়েছিল কেউ জানে না। তাই বাড়ির লোকেরা এই ছবিটা দেখলেই বেশ বিব্রত হত। বলত, এ ছবিটা যে কার কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের কেউ নয় নিশ্চয়ই। মনোজ তাই একটু বড় হয়ে ছবিটা অন্যান্য ছবি থেকে আলাদা করে নিয়ে এসে তার গল্পের বইয়ের তাক-এ একটা ছোটদের রামায়ণ-বইয়ের পাতার ভাঁজে যত্ন করে রেখে দিয়েছে। নিজের কাছেই রাখা ভাল, নইলে কে কবে বাজে ছবি ভেবে ফেলে-টেলে দেবে।

মনোজদের বাড়িতে অনেক লোক। ঠাকুমা, বাবার এক বুড়ি পিসি, মা, বাবা, দুই কাকা, দিদি, দাদা, দুটো ডলপুতুলের মতো ছোট ভাইবোনে। এ ছাড়া বাড়িতে থাকে একটা নিরাশ্রয় বুড়ো লোক, তার বাড়ি বিহারে। একটা বাচ্চা চাকর, একটা রান্নার ঠাকুর, এক বুড়ি ঝি। তা ছাড়া বিস্তর বাইরের লোকজনের রোজ আসা-যাওয়া তো আছেই। যেমন পুরুতমশাই সতীশ ভরদ্বাজ, মাস্টারমশাই দুঃখহরণবাবু, দিদির গানের মাস্টারমশাই গণেশ ঘোষাল, এমনি আরও কত কে!

উবু হয়ে না-বসলে দুঃখহরণবাবু পড়াতে পারেন না। যদি কেউ তাঁকে আসন-পিঁড়ি করে বসিয়ে দেয়, বা চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসতে বলে, তা হলেই দুঃখহরণবাবুর বড় বিপদ। তখন তিনি অঙ্ক ভুল করেন, ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোল গুলিয়ে ফেলেন, ইংরেজি ট্রান্‌স্লেশন করতে হিমসিম খান। যেই উবু হয়ে বসলেন, অমনি তাঁর আঙুল দিয়ে পনেসিল বেয়ে হড়হড় করে অঙ্ক, ট্রান্‌স্লেশন, জ্যামিতি সব নেমে আসতে থাকে, মুখে খই ফোটে ইতিহাস আর ভূগোলের।

সকালবেলাতেই দুঃখহরণবাবুর বিপদ। সেই সময়টায় মনোজের বাবা রাখোহরিবাবু পড়ার ঘরে এসে বসে গম্ভীরভাবে খবরের কাগজ পড়েন। রাখোবাবু ভীষণ রাশভারী লোক, বাড়ির কুকুরটা বেড়ালটা পর্যন্ত তাঁকে ভয় খায়, বাড়ির লোকজনের তো কথাই নেই। কিন্তু সকালবেলাতে রাখোবাবু যে মনোজদের পড়ার ঘরে এসে বসেন তার একটা কারণ আছে। এ-বাড়িতে একজন মানুষ আছেন, যিনি রাখোবাবুকে মোটেই ভয় খান না, বরং উল্টে রাখোবাবুই তাঁর ভয়ে অস্থির। তিনি রাখোবাবুর পিসিমা আদ্যাশক্তি দেব্যা। বাবার পিসিকে ঠাকুমা ঠাকুরঝি বলে ডাকেন, সেই থেকে মনোজরা সবাই তাঁকে 'ঠাকুরঝি' ডাকে। তিনি খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলনে, সেই থেকে উপোস-টুপোস করে করে বুড়ো বয়সে ভীষণ তেজস্বিনী হয়ে গেছনে। কারও তোয়াক্কা করেন না। তাঁর আবার ভয়ংকর শুচিবাই। সকালে কাঁচা গোবর জলে গুলে সেই জল সারা বাড়িতে ছিটিয়ে

দনে। মনোজদের পড়ার ঘরটা বাড়ির বাইরে, বাগানের ধারে। একটেরে ছোট্ট একটু ঘর, তাতে এক ধারে পড়ার টেবিল চেয়ার, অন্য ধারে তক্তপোশের ওপর দুঃখহরণবাবুর বিছানাপত্র। এই ঘর অবধি ঠাকুরঝি আসতে পারেন না, খোঁড়া পায়ে বাগান পেরোতে কষ্ট হয়। তাই এ-ঘরটা গোবরজলের হাত থেকে বেঁচে যায়। রাখোবাবু তাই গোবরের গন্ধ এড়িয়ে নিশ্চিন্তে শ্বাস নেওয়ার জন্য এই ঘরে এসে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে যান, ততক্ষণে ঘরদোরের জল শুকিয়ে যায়।

রাখোবাবু কড়া ধাতের লোক, আদবকায়দার নড়চড় দেখলে খুব রাগ করেন। তাই সে-সময়টায় দুঃখহরণবাবুকে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে হয়। আর ওই এক ঘন্টায় দুঃখহরণবাবু রাজ্যের ভুলভাল করতে থাকনে। একদিন তিনি ওই অবস্থায় ট্রানস্লেশন করতে গিয়ে 'তখন হলঘর ভরিয়ে গিয়াছে' এই বাক্যটার ইংরেজি করলেন 'বাই দেন দি হল রুম ওয়াজ ফুলফিলড'। এই ইংরেজি শুনে বাবা তাঁর ইংরেজি খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বিরক্ত হয়ে তাকালেন। ছেলেমেয়ের সামনে মাস্টারমশাইয়ের ভুল ধরলে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা কমে যেতে পারে, সেই জন্য বললেন—"দুঃখবাবু, ইংরিজিটা ঠিকই আছে, তবে একটু কানে কেমন যেন লাগছে। আর একবার অন্যভাবে করুন।" কিন্তু দুঃখহরণবাবু পা ঝুলিয়ে বসে আছেন যে, তার ওপর রাশভারী রাখোবাবুর কথা শুনে আরও ঘাবড়ে গিয়ে খুব শক্ত ইংরেজিতে বললেন—"দি হল'স্ ফুলফিলমেন্ট ওয়াজ অ্যাচিভড বাই দেন।" শুনে রাখোবাবু আর মুখ তুললেন না। দুঃখহরণবাবুও গোলমালটা বুঝতে পারছেন, কিন্তু উবু হয়ে না-বসলে তাঁর মুড আসে না। তাই তিনি ঠ্যাং দুটো জোর-নাচাতে-নাচাতে মুখে 'হুঁ হুঁ' করে একটা শব্দ করে যেতে লাগলেন। দাদা সরোজ, দিদি পুতুল, আর মনোজ চুপিসারে হাসাহাসি করছে।

শীতকাল। বাগানে, খুব ফুল ফুটেছে। সামনের দিকটায় মস্ত মস্ত গাঁদা ফুটে আছে, সেগুলো এত বড় যে দু হাতে মুঠো করেও বেড় পাওয়া যায় না। মোরগ ফুল, পপি, গোলাপ তো আছেই। ফটফটে রোদে প্রজাপতি আর ফড়িং উড়ছে অনেক, পোকামাকড় টি টি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাগানের অন্য ধারে পালং খেত, ফুলকপি, ওলকপি, ধনেপাতা, বেগুন লাগানো হয়েছে। সেই সবজি খেতে দেহাতি বুড়ো মানুষ রামখিলাওন খুরপি হাতে ঘুরঘুর করছে। যদিও একটা ঠিকে মালী এসে বাগানের কাজ করে যায় রোজ, তবু রামখিলাওন কাজ দেখানোর জন্য বাগানে সব সময়ে কিছু খোঁড়াখুঁড়ি করবেই। চোখে ভাল দেখতে পায় না, অনেক সময়ে গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়ে আলগা করতে গিয়ে শেকড়বাকড় উপড়ে ফেলে। আগাছা তুলতে গিয়ে ফুলগাছ তুলে ফেলে দিয়ে আসে। বকুনি খেলে খুব গম্ভীরভাবে থাকে, যেন এ-সব বকাবকি তার তেমন গায়ে লাগে না। গতবার ঠাকুমার চশমা পালটানো হল, আর রামখিলাওন ঠাকুমার পুরনো চশমাটা চেয়ে নিল। সেই চশমাটা এখন সব সময়ে চোখে পরে থাকে। তাতে যে সে ভাল দেখতে পায় তা নয়। কিন্তু এমন ভাব দেখায় যে খুব ভাল দেখছে। চশমা পরে ইজ্জতও বেড়ে গেছে তার। বাজারের কাছে দেশওয়ালী ভাইদের কাছে চশমা পরে যাওয়ায় সেখানে তার খাতিরও নাকি বেড়ে গেছে। বাড়ির চাকর রঘু তাকে 'রামু' বলে ডাকলে বা তুই-তোকারি করলে সে ভারী চটে যায়। রঘু তাই তাকে আজকাল 'রামুবাবু' বলে ডেকে আপনি-আজ্ঞে করে। কিন্তু সন্ধে হলেই রঘু নানা কায়দা করে রোজ রামুকে ভূতের ভয় দেখাবেই।

আজ দুঃখহরণবাবুর ভুলভাল কিছু বেশি হচ্ছে। দাদা সরোজকে ইতিহাস বোঝাতে গিয়ে তিনি বরাবার ওয়ার্ড মিনিং বোঝাতে লাগলেন, ইতিহাস বইতে দুটো ব্যাখ্যাও দাগিয়ে দিলেন। পুতুলকে সুদ-কষা বোঝাতে

গিয়ে তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, "মুখস্থ যেন ভুল না হয়, আর দাঁড়ি কমা সেমিকোলন সম্পর্কে সাবধানে থাকবে।" মনোজের ভুগোল-বই খুলেও তিনি গোলযোগ করে ফেললেন, পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জেলায় ধান ও পাট জন্মায় তা বলতে গিয়ে তিনি বারবার 'নর' শব্দের রূপ এনে ফেলছিলেন। তাই শুনে রাখোবাবু বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন। ঘরে গোবরের গন্ধ, পড়ার ঘরে ভুলভাল পড়ানো, কোথায় আর যাবেন। তাই বাগানে পায়চারি করতে-করতে দেখেন, রামু একমুঠো দুব্বো ঘাস, কয়েকটা কড়াইশুঁটি আর একটা গাজর বাগান থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

রাখোবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওসব কোথায় নিচ্ছিস রে রামু? দেখি, কী তুলেছিস?"

রামু একগাল হেসে হাতের জিনিসগুলো দেখিয়ে বলল, "বুড়ি মা পাঠালেন কিছু ধনেপাতা, কাঁচা লঙ্কা আর একটা মুলো তুলে আনতে।"

রাখোবাবু রেগে অস্থির। বললেন, "স্টুপিড, কবে থেকে বলছি হাসপাতাল থেকে চোখের ছানি কাটিয়ে আয়। কিছুতেই শুনবি না? কোন্ আক্কেলে তুই লঙ্কা বলে কড়াইশুটি, মুলো মনে করে গাজর আর ধনেপাতার বদলে গুচ্ছের ঘাস তুললি। আজই চল্ তোকে হাসপাতালে নিয়ে যাব, চোখ কাটিয়ে আসবি।"

শুনে রামু ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। রাখোবাবু রাগারাগি করতে-করতে ভিতর-বাড়িতে চলে গেলেন। পড়ার ঘরে দুঃখবাবু চেয়ারের ওপর টপ্ করে উবু হয়ে বসতেই তাঁর চেহারা পাল্টে গেল। মুহূর্তের মধ্যে তিনি ধান ও পাটের জেলা ঝরঝরে মুখস্থ বলতে লাগলেন, সুদকষা জল করে দিলেন, ইতিহাসের সন-তারিখ সুদ্ধু আকবরের খুড়তুতো ভাইয়ের নাম পর্যন্ত তাঁর মনে পড়ে গেল।

ঠাকুমা বামাসুন্দরী ডালের বড়ি দিচ্ছিলেন রোদে বসে। একটা কাক তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে জ্বালাতন করছে। কাকটার সাহসেরও বলিহারি! এ বাড়িতে ঠাকুরঝি জেগে থাকতে বেড়াল কুকুর কাকপক্ষী ঢুকতে বড় একটা সাহস পায় না। কে কোথাকার এঁটোকাটা আঁস্তাকুড় টেনে আনে ঘরে, সেই ভয়ে ঠাকুরঝি লাঠিটি হাতে সারা বাড়ি খোঁড়া পায়ে ডিং মেরে-মেরে ঘুরে বেড়ান। কত কুকুর, বেড়াল, কাকপক্ষী যে তাঁর হাতে রামঠ্যাঙ্গা খেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। ইদানীং তিনি শুধু লাঠির ওপর ভরসা না-রেখে পেয়ারা গাছের ডাল কাটিয়ে একটা গুলতি বানিয়ে নিয়েছেন। গুলতির যে চামড়ার অংশটুকুতে গুডুল ভরতে হয়, সে-জায়গাটায় চামড়ার বদলে কয়েক পাল্লা ন্যাকড়ার পট্টি লাগিয়ে নিয়েছেন, চামড়া ছুঁতে পারেন না। গুল্‌তি ছুড়ে ছুড়ে ঠাকুরঝির হাতের টিপও হয়েছে চমৎকার। সট সট করে গুডুল ছোড়েন, ঠিক গিয়ে বেড়ালের লেজের লোম খসিয়ে দেয়, কাকপক্ষীর ডানার পালক ঝরে যায়, কুকুরের ঠ্যাং খোঁড়া হয়। এ বাড়িতে আদ্যাশক্তি আছেন জেনেও কাকটা ঘুরঘুর করছে। তেল-মাখানো কাঁসার থালা, টিনের টুকরো রোদে পেতে দিয়েছেন বামাসুন্দরী, ডাল ফেটাচ্ছেন। ডাল ফেটানোতে তাঁর জুড়ি নেই। বারো মাস ডাল ফেটিয়ে তাঁর ডান হাতে বেশ জোর হয়েছে। পাঞ্জা কষলে মেজকাকা ব্যায়মবীর হারাধনও ঠাকুমাকে হারাতে বেগ পাবেন। তা ঠাকুমা ডাল ফেটাচ্ছেন। কাকটা ঘুরঘুর করছে। ডালে কালোজিরে মেশাবেন বলে কালোজিরের পুরিয়াটা পাশেই রেখেছেন। কাকটা এক ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল।

ঠাকুমা চেঁচালেন, "ও ঠাকুরঝি!"

কিন্তু ঠাকুরঝি তখন কোথায়! কেউ সাড়া দিল না।

ঠাকুমা বকবক করতে করতে উঠলেন। কাকটা পেঁপে গাছে উঠে বসে ছিল। কী খেয়ালে হুউশ করে উড়ে এসে ঠাকুমার খোঁপায় একটা ছোঁ মারল। তাতে ঘোমটা খসে গেল। ঠাকুমা ফের চেঁচালেন, "ও ঠাকুরঝি! কাকটার ভাবসাব মোটেই ভাল দেখছি না। গুলতিটা নিয়ে এসো!"

পুরুতমশাই সতীশ ভরদ্বাজ ঘোষালবাড়ির নারায়ণ পুজো সেরে ফিরছেন। এ-সময়টায় মনোজদের বাড়িতে বসে তিনি খানিক খবরের কাগজ পড়ে যান, যাওয়ার সময়ে গৃহদেবতার ভোগটাও নিবেদন করে যান। এক কাপ চা, দুটো বিস্কুট আর পাঁচটা পয়সা তাঁর রোজকার বরাদ্দ। তিনি উঠোনে ঢুকে দেখেন, বামাসুন্দরী ডালের বাটি ফেলে বারান্দায় উঠে গিয়ে চেঁচামেচি করছেন, কাকটা ফেটানো ডালে নেচে বেড়াচ্ছে, সব ছয়ছত্রখান। বামাসুন্দরী তাঁকে দেখে প্রায় কেঁদে ফেললেন, "দেখেছেন ঠাকুরমশাই, দজ্জাল কাকের কাণ্ডটা?"

সতীশ ভরদ্বাজ বড় খাইয়ে মানুষ। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, বড় ভুঁড়ি, বয়স সত্তরের কাছাকাছি। এ-বয়সেও জোয়ানমদ্দরা মাছ বা রসগোল্লার কম্পিটিশনে তাঁর ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না। পাতে পড়তে-না-পড়তে তুলে ফেলেন। লোকে বলে তাঁর নাকি দুটো পোষা ভূত আছে, খাওয়ার সময়ে আবডাল থেকে তারাই সব তুলে খেয়ে ফেলে। নইলে ঠাকুরমশাই কি আর ওই অত চারটে মানুষের সমান খাবার খেতে পারেন? তবে সতীশ ভরদ্বাজ যে ভূত পোষেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রায় সময়েই দেখা যায়, খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ তিনি 'উঁ' বলে যেন কার নিঃশব্দ ডাকে সাড়া দেন, ঘাড় ঘুরিয়ে হঠাৎ যেন কার সঙ্গে ফিসফিস করে খানিক কথা বলে নেন, আবার কখনও হঠাৎ রাস্তাঘাটে চেঁচিয়ে 'হাঁদু', 'ভুঁদু' বলে কাদের ডাকাডাকি করেন। এইসব কারণে সবাই তাঁকে খানিকটা ভয় খায়।

কাকের কাণ্ড দেখে সতীশ ভরদ্বাজ দাঁড়িয়ে গেছেন।

কিছুক্ষণ দেখেটেখে একটা শ্বাস ফেলে খড়মের শব্দ তুলে বারান্দায় উঠে এলেন। তাঁর জন্য রোদে গদিওলা মোড়া পেতে রাখা আছে, তাইতে বসে বললেন, "কাক! এ-বাড়িতে মা আদ্যাশক্তি থাকতে কাক আসবে কোত্থেকে! তেমন সাহসী কাকই বা কই?"

ঠাকুমা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন, "ওই দেখুন লক্ষ্মীছাড়া এক বাটি মাসকলাই-বাটা নষ্ট করল। কত কষ্ট করে ফেটিয়েছি।"

"ও কাক নয় মা।" সতীশ ভরদ্বাজ গম্ভীর হয়ে বলেন।

"তবে কী?"

সতীশ ভরদ্বাজ আবার একটা শ্বাস ছাড়েন।

রঘু এসে খবরের কাগজ দিয়ে গেল। সতীশ ভরদ্বাজ কাগজ খুলে আইন-আদালতের খবর পড়তে-পড়তে বললেন, "চল্লিশ বছর আগে জয়দেবপুরে একবার এই রকম কাকের পাল্লায় পড়েছিল মোক্ষদা ঠাকুমা। দেখতে অবিকল দাঁড়কাক, কিন্তু তার হাবভাব আর দুষ্টুবুদ্ধিতে ঠাকুমা অস্থির। রোজ এসে সব লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করে যায়। তীর-ধনুক, ঢিল-পাটকেল, কাকতাড়ুয়া কোনও কিছুকে গ্রাহ্য করে না। সবশেষে জ্বালাতন হয়ে ডেকে পাঠাল আমাকে। গিয়েই বুঝলাম কাকের রূপ ধরে এ কোনও আত্মা-টাত্মা এসেছে। বললাম, এ কাক তো

তাড়ালে যাবে না ঠাকুমা, নারায়ণ-পুজো দাও, আর শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাও। সেই করতেই কাকটা যে পালাল, আর এল না। এ কাকটাকেও দেখুন না, যেন ঠিক কাক। কিন্তু কাকের মতো ব্যবহার কি? একটু লক্ষ করলেই দেখবেন, এ-পাখিটা কাকের চেয়েও কালো, ওর লাফানোটাও কাকের মতো নয়। এ-সব কিসের লক্ষণ সে আমি জানি। বাড়িতে একটা অমঙ্গল না হয়!”

ঠাকুমা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখে কথা নেই।

আর এ-সময়ে গোয়ালঘরের দিক থেকে সোরগোল উঠল, রঘু আর বুড়ি কি কিরমিরিয়া চিৎকার করে বলছে, “ঠাকুরঝি পড়ে গেছে, ঠাকুরঝি পড়ে গেছে।”

তা এরকম সোরগোল প্রায়ই ওঠে। ঠাকুরঝি সাত দিনে সাতবার আছাড় খান। লোকে বলে, ওইটাই তাঁর নেশা। তাঁর হবি। যেখানে কেউ কোনওদিন পড়ে যায় না এমন শুকনো সমতল জায়গাতেও ঠাকুরঝি তাঁর বরাদ্দ আছাড়টা খেয়ে নেন। শোনা যায়, দেশের বাড়িতে সেই ঢাকা জেলার গ্রামে থাকতেও তিনি প্রায়ই ঘরের পাটাতনে মই বেয়ে পুরনো তেঁতুল কি আমচুড় পাড়তে উঠে আছাড় খেতেন, পুকুরঘাটে পড়তেন, উঠোনে হড়কাতেন, এমন কী খোঁটায় বাঁধা গরু পর্যন্ত তাঁকে দেখলে দৌড়ে এসে দড়ির প্যাঁচ মেরে ফেলে দিত। অত সব আছাড় খেয়ে খেয়েই তাঁর পা একটু খোঁড়া, হাতও একটু বাঁকা, গ্রামদেশে তো হাড় জোড়া দেওয়ার ডাক্তার ছিল না, গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার পট্টি বেঁধে ছেড়ে দিত। ভাঙা হাড় বাঁকা হয়ে জোড়া লেগে যেত।

ঠাকুরঝি আছাড় খেয়েছেন শুনে পড়া ভণ্ডুল হয়ে গেল। মনোজ, সরোজ, পুতুল তিন ভাই-বোন যথাক্রমে ভূগোল, অঙ্ক, ইতিহাস ফেলে দৌড়ে উঠে এল। দুঃখবাবু উবু হয়ে বসে মন দিয়ে অঙ্ক কষছিলেন। অনেকক্ষণ বাদে টের পেলেন যে, সামনে ছাত্রছাত্রীরা কেউ নেই।

ভারী বিরক্ত হয়ে তিনি তখন গানের মাস্টারমশাই গণেশ ঘোষালের ঘরে গেলেন দুটো গল্প করতে। গিয়ে দেখেন, সেখানেও এক গোলমাল।

গণেশবাবু আত্মহত্যা করবেন বলে চালের বিমের সঙ্গে একটা মোটা দড়ির ফাঁস ঝুলিয়ে দড়িটা টেনেটুনে দেখছেন।

দুঃখবাবু বললেন, “এ কী?”

দৃশ্য দেখে দুঃখহরণবাবু চমকে উঠলেন না। মাসের মধ্যে দু-তিনবার গণেশ ঘোষাল আত্মহত্যার চেষ্টা করে থাকেন।

দুঃখবাবু দড়িটা দেখে বললেন, “ভাল বাঁধা হয়নি।”

গণেশবাবু ফাঁসটা ধরে একটু ঝুল খেয়ে বলেন, “না, দিব্যি শক্ত হয়েছে।”

দুঃখবাবু মাথা নেড়ে বলেন, “দড়িটাও বেশ পুরনো, মাঝখানে ফেঁসো বেরিয়ে আছে। ফাঁস গলায় দিয়ে ঝুলবার সময়ে যদি দড়ি ছিঁড়ে যায় তো পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে।”

গণেশবাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, “ভাঙে ভাঙুক। ভারী তো তুচ্ছ হাত-পা। মরতে গেলে হাত-পায়ের চিন্তা করলে চলে না মশাই।”

দুঃখবাবু ভেবে চিন্তে বলেন, “সে অবশ্য ঠিক। দড়িটা কি গোয়াল থেকে আনলেন নাকি?”

গণেশবাবু মাথা নেড়ে বলেন, "হ্যাঁ। গরুর গলা থেকে খুলে এনেছি। বদমাশ গরুটা ঢুসিয়ে দিতে এসেছিল, কোনওক্রমে বেরিয়ে এসে দরজার ঝাঁপটা টেনে দিয়েছিলাম ভাগ্যিস।"

দুঃখবাবু চেয়ারে পা তুলে বসে বললেন, "এই সকালবেলাতেই মরতে চাইছেন কেন? সকালবেলাটা সুইসাইড করার পক্ষে ভাল না। হুটহাট লোকজন এসে পড়তে পারে। এ-সব গভীর রাতে করতে হয়, যখন কেউ এসে বাঁচাতে পারবে না।"

"হুঁঃ।" বলে গণেশবাবু দুঃখবাবুর দিকে একটু কটমট করে চেয়ে থেকে বললেন, "গভীর রাত পর্যন্ত আমি জেগে থাকতে পারি না। এত ঘুম পায় যে, মরা-টার কথা মনেই থাকে না।"

"আজকে কী হয়েছিল যে, মরতে যাচ্ছেন?"

গণেশবাবু মুখখানা ভার করে চোখ ছলছলিয়ে বললেন, "আবার কী! সেই সুরে ভুল। সকালে বসে হংসধ্বনি রাগটার ওপর একটু ঘষামাজা করছিলাম, পরপর দুবার তালে লয়ে ভুল হয়ে গেল। কালু মিশিরের শিষ্য আমি, আমার ভুল হওয়ার মানে তো পৃথিবীতে প্রলয় হয়ে যাওয়া। গুরুজি তো আজ প্রায় ত্রিশ বছর হল দেহ রক্ষা করেছেন, তবু যখন সকালে রেওয়াজ করতে বসি তখন যেদিন ঠিকঠাক সুরে-লয়ে-তালে গাই সেদিন নির্ঘাত শুনতে পাই অনেক দূর থেকে যেন মৃদু একটা তবলায় ঠেকা দেওয়ার শব্দ আসছে। গায়ে কাঁটা

দেয় মশাই, পরিষ্কার বুঝতে পারি স্বর্গে বসে গুরুজি আমার গান শুনছেন, আর তবলার ঠেকা দিয়ে দিয়ে সম আর ফাঁক দেখিয়ে দিচ্ছেন। কখনও কখনও তারিফ করে 'কেয়াবাত' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন।"

"ওরে বাবা," দুঃখবাবু বলে ওঠেন। অবশ্য কথাটা তিনি গণেশবাবুর গুরুজির কথা শুনে বলেননি, আসলে তাঁকে এ সময়ে কুটুস করে একটা ছারপোকা কামড়েছিল। তিনি উবু হয়ে বসেই চেয়ারে ছারপোকা খুঁজতে লাগলেন।

গণেশবাবু চোখ মুছে বলেন, "জীবন তুচ্ছ, তালেই যদি ভুল হল, লয়ই যদি গোল পাকাল, তা হলে বেঁচে থেকে লাভ কী?"

ছারপোকা খুঁজতে খুঁজতে দুঃখবাবু বলেন, "কাজটা ভাল করেননি।"

"না না, বেশ করছি। আপনি আমাকে বাধা দেবেন না। মরে গুরুজির কাছে যাব, তিনি আমাকে মুখোমুখি পেয়ে পায়ের নাগরাটা দিয়ে আচ্ছাসে জুতোপেটা করবেন, তবে আমার শান্তি। এ-কাজে আমাকে বাধা দেবেন না দুঃখবাবু।"

দুঃখবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, "কে বাধা দিচ্ছে! মরতে হয় মরুন, তা বলে গোয়াল থেকে দড়িটা আনা আপনার ঠিক হয়নি। একটু আগেই গোয়ালঘর থেকে চেঁচামেচি আসছিল, বোধহয় আদ্যাশক্তিদেবী গোয়ালে গোবর আনতে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে ছাড়া গরুটা তাঁকে বুঝি খুব ঢুঁসিয়ে দিয়েছে। ও গরুটা রামু ছাড়া কাউকে মানে না! এখন যদি সকলে গরুটা কে ছাড়ল তা খুঁজে দেখতে গিয়ে আপনার ঘরে এসে চোরাই দড়িটা পায় তো বড় লজ্জার কথা।"

গণেশবাবুর মুখটা শুকিয়ে গেল, বললেন, "তাই তো!"

"সব কিছুই ভেবেচিন্তে করতে হয়। গলায় দড়ি দেওয়ারও একটা ক্যালকুলেশন আছে। হুঁ-হুঁ! পটেশ্বর ওঝা রেল লাইনে গলা দিতে গিয়েছিল তার বউয়ের সঙ্গে রাগারাগি করে। রাতে গিয়ে লাইনে গলা দিয়ে পড়ে রইল, কিন্তু গাড়ি আর আসে না। পটেশ্বরকে খাতির করতে গাড়ি তো আর আগেভাগে এসে পড়তে পারে না, তারও টাইম আছে। তা পটেশ্বর অপেক্ষা করতে করতে কখন লাইনে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভোরবেলা গাড়ি এল, কিন্তু অনেক দূর থেকেই ড্রাইভার সাহেব রেল লাইনে মানুষ শুয়ে আছে দেখে গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিনের কু দিল। সেই কু শুনে ঘুম ভাঙতেই পটেশ্বর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে ভাবল, যাক বাবা, মরা-টর হয়ে গেছে। ব্যথাট্যথাও খুব একটা পেতে হয়নি। এই ভেবে সে ঘাড়ে হাত দিতে ঘাড়খানা আস্ত দেখে আরও খুশি হয়ে হয়ে গেল। ভাবল, মরার পর বোধহয় কাটা ঘাড় ফের জোড়া লেগে যায়। এই সময়ে ড্রাইভারসাহেব নেমে এসে পটেশ্বরকে এই মার কি সেই মার। বলে—রেল লাইনটা তোমার মামদোগিরির জায়গা? সেই মার খেয়ে পটেশ্বর পনেরো দিন হাসপাতালে ছিল। ক্যালকুলেশনের ভুলে তার মরাও হল না, বরং মার খেয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হল। তাই বলছিলাম।"

আদ্যশক্তিদেবী আছাড় খেয়েছেন শুনলে কেউ আজকাল আর অবাক হয় না। কেউ যদি কাউকে গিয়ে বলে, জানো, আদ্যাশক্তি দেবী আছাড় খেয়েছেন? তা হলে যাকে বলা হয় সে একটু অবাক হয়ে বলবে, হ্যাঁ, সে আর বলার কী? উনি তো প্রায়ই তো খেয়ে থাকেন। ওটাই ওঁর অভ্যাস, নেশা।

তবু কেউ যদি আছাড় খায়ই, সে আদ্যশক্তি দেবীই হোন বা আর যে কেউ হোক, নিয়ম হল লোকজন গিয়ে তাকে ধরাধরি করে তুলবে। গোয়ালঘরের চেঁচামেচি শুনে তাই সবাই দৌড়ে গেল।

গিয়ে দেখে, গোয়ালঘরের এক কোণে যেখানে মনোজের কাকা বৈজ্ঞানিক এবং ব্যায়ামবীর হারাধন গোবর গ্যাস তৈরি করার জন্য বিশাল এক গর্তে গোবরের তাল জমিয়ে রেখে পচাচ্ছিল সেখানে আদ্যাশক্তিদেবীর অর্ধেক ডুবে আছে। তিনি নিঃশব্দে চেঁচাচ্ছেন। অর্থাৎ তাঁর মুখ নড়ছে, কিন্তু শব্দ বেরোচ্ছে না।

রাখোবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "এ নিশ্চয়ই হারিকেনের কাজ।"

বুড়ি ঝি কিরমিরিয়ার অভ্যাস হল, বাড়িতে কোনওরকম ঘটনা ঘটলেই সে বিলাপ করে কাঁদতে বসবে। রাখোবাবু যদি মনোজকে বকেন তো কিরমিরিয়া কাঁদতে বসে। পুতুলের ড্রইং-এর খাতা হারালেও কারও কিছু নয়, কিরমিরিয়া বিলাপ করতে বসল—ও বাবাগো, খোঁকির খাতাটা কোথায় গেল গো? খোঁকির এখন কী হবে গো! ইস্কুলের দিদিমণি এখন খোঁকিকে বক্‌বে গো! সারাদিন তার বিলাপের জ্বালায় সবাই অস্থির। এখন বাড়িতে যাই ঘটুক, কিরমিরিয়াকে কেউ কিছু খবর দেয় না।

প্রায় দুদিন কিরমিরিয়া বিলাপ করেনি। বিলাপ না করলে তার পেট ফেঁপে যায়, খিদে নষ্ট হয়ে মুখে অরুচি হয়। রোগাও হয়ে যায় সে। দুদিন বাদে আজ জবর ঘটনা দেখে কিরমিরিয়া গিয়ে গোবরে অর্ধেক ডুবে-থাকা আদ্যাশক্তি দেবীর মুখের সামনে উবু হয়ে বসে মনের সুখে কেঁদেকেটে বিলাপ করতে লাগল, "ও ঠাকুরঝি গো, এত জায়গা থাকতে তুমি কেন গোবরে গিয়ে পড়লে গো! উঠোনে পড়লে না, পুকুরে পড়লে না, ছাদ থেকে পড়লে না, গোবরে গিয়ে পড়লে গো! এখন তোমারই বা কী হবে, গোবরেই বা কী হবে গো?"

খবর পেয়ে পাড়ার লোকজনও সব এসে জুটেছে। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে শ্রুতিধর ঘোষ। শ্রুতিবাবুর এক অভ্যাস, কিছু দেখলে বা শুনলে তাঁর আর-একটা কিছু মনে পড়ে যায়। কিন্তু ঠিক মনে পড়ে বলেও বলা যায় না। কী যেন একটা মনে আসি-আসি করে, কিন্তু আসে না। যেমন একবার দুঃখবাবুর পেটের ব্যথা হওয়ায় তিনি এসে বললেন, "পেটের ব্যথার তিনটে খুব ভাল ওষুধ আমি জানি।"

"কী বলুন তো!" দুঃখবাবু খুব উৎসাহের সঙ্গে বলেন।

তখন অনেকক্ষণ চিন্তা করে শ্রুতিবাবু বললেন, "একটা হল গিয়ে ইয়ে, মানে ওই আর কী।"

রাখোবাবু পাশেই ছিলেন, বললেন, "আর দুটো?"

শ্রুতিবাবু আবার চিন্তা করে বললেন, "আর একটা যেন কী! আর তৃতীয় ওষুধটার নাম ভুলে গেছি।"

তবু সবসময়েই শ্রুতিবাবুর কী যেন মনে-পড়ি-পড়ি করে, এই যেন এক্ষুনি মনে পড়ে যাবে, প্রায় এসে গেছে মাথায়।

সেই শ্রুতিবাবু আদ্যাশক্তির অবস্থা দেখে বললেন, "গোবরে...গোবরে..কী যেন?"

তার ভাইপো ফচকে ফটিক বলল, "গোবরে পদ্মফুল?"

"না, না। গোবরে আর একটা কী যেন!"

"গুবরে পোকা।"

"দূর ফাজিল।" শ্রুতিবাবু রেগে যান। তারপর রাখোবাবুর দিকে চেয়ে বলেন, "ব্যাপারটা কী হল মশাই? গোবরে পিসিমা কেন?"

রাখোবাবু খুব ভেবেচিন্তে বলেন, "আমরাও তাই ভেবে মরছি। তবে মনে হয় এটা হারিকেনের কাজ। "

"হারিকেন!" বলতে গিয়েই শ্রুতিবাবু আবার কী যেন মনে আসি-আসি করে। ভাবতে ভাবতে বলেন, "হারি,হারি! হারি আপ কী-একটা কথা আছে না? তার মানে বলতে চাইছেন, হারি মানে তাড়াহুড়ো করতে

গিয়ে পিসিমার এই দশা! এখন প্রশ্ন হল কেন, কেন এই হারি! হারি কেন? তাই না?”

রাখোবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, “মোটেই না। আমাদের বদমাশ গরুটার নাম হারিকেন। হারিকেন হচ্ছে একরকমের সামুদ্রিক ঝড়। ও বাচ্চা ছেলেও জানে। আমাদের গরুটা ঝড়ের মতো দৌড়য়, গুঁতোয়, বেড়া ভাঙে, গাছ ওপড়ায় বলে ওর ওই নাম রাখা হয়েছে। মনে হচ্ছে সেই গরুটাই পিসিমাকে গুঁতিয়ে নিয়ে গোবরে ফেলেছে। কিন্তু গরুটা তো বেশ ভাল করে বাঁধা ছিল, একটু বাদে তাকে মাঠে নিয়ে গিয়ে রঘু খোঁটা পুঁতে দিয়ে আসবে কথা ছিল। সেটা ছাড়া পেল কীভাবে?”

এক গাল হেসে শ্রুতিবাবু বললেন, “ওই হল। হারিকেনের গুঁতোর ভয়ে হারি করতে গিয়ে তাড়াতাড়ি পিসিমা গোবরে পড়েছেন। কিন্তু গোবর নিয়ে কী একটা কথা আছে, কিছুতেই মনে পড়ছে না।”

এই বলে শ্রুতিবাবু ভাবেন।

ফটিক বলে, “ষাঁড়ের গোবর।”

“দূর।”

“মাথায় গোবর।” ফটিক ফের বলে।

শ্রুতিবাবু তার দিকে কটমট করে তাকান।

ফটিক ফচ্‌কে হেসে বলে, “পালোয়ান গোবরবাবু?”

কিরমিরিয়া একটু কান্না থামিয়ে কথাবার্তা শুনে নিয়ে ফের ডুকরে ওঠে, “ও বাবা গো, হারিকেনটাই বা কোথায় গেল গো! সে যে এখনও ভাল করে সকালের জাবনা খায়নি গো! সে যে না খেয়ে খেয়ে ল্যাজে গোবরে হয়ে যাবে গো!”

“ওই!” শ্রুতিবাবু চেঁচিয়ে উঠে বললেন, “ওই মনে পড়েছে। ল্যাজে গোবরে! হেঃ হেঃ, এ যে দেখছি পিসিমার একেবারে ল্যাজে গোবরে অবস্থা!”

আদ্যাশক্তিদেবী বুক সমান গোবরের গর্তের মধ্যে পোঁতা। ঘন গোবরের টালের ভিতর থেকে নিজে-নিজে বেরিয়ে আসবেন সে সাধ্য নেই। ঘন মধুর মধ্যে পড়লে মাছি যেমন আটকে যায়, তাঁর অনেকটা সেই দশা। অনেকক্ষণ চেঁচামেচি করায় গলা বসে গেছে, বাক্য বেরোচ্ছে না। তিনি দুহাত বাড়ির সবাইকে বলতে চাইছেন, “ওরে তোরা আমাকে টেনে তোল।”

কিন্তু সে কথায় কেউ কান দিচ্ছে না।

দুঃখবাবু আর গণেশবাবু এসে গোয়ালঘরে ঢুকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গণেশবাবুর চাদরের তলায় গরুর দড়িটা লুকোনো আছে, কিন্তু সেটা বের করতে সাহস হচ্ছে না।

মনোজ দুঃখবাবুকে জিজ্ঞেস করল, “মাস্টারমশাই গোবরের ইংরিজি কী?”

“কাউডাংগ।”

“আর পিসিমা হল আন্ট, না?”

“হ্যাঁ।”

“তা হলে গোবরে পিসিমা কেন, এর ইংরিজি হবে হোয়াই আন্ট ইজ ইন কাউডাংগ, না মাস্টারমশাই?”

“হুঁ।”

“ল্যাজে গোবরের ইংরিজি কী হবে মাস্টারমশাই?”

দুঃখবাবু বলতে পারলেন না। সন্তর্পণে একবার রাখোবাবুর দিকে তাকালেন। রাখোবাবু ভ্রূ কুঁচকে দুঃখবাবুর দিকেই চেয়ে ছিলেন। বললেন, "এরকম ছোটখাটো সব ঘটনার ভিতর দিয়ে শেখালে ছেলেদের শিক্ষা ভাল হয়। ল্যাজে গোবরের ইংরিজিটা ওকে শিখিয়ে দিন দুঃখবাবু।"

দুঃখবাবু দুঃখের সঙ্গে মাথা চুলকোলেন। বললেন, "টেইল ইন কাউডাংগ। অ্যান্ড কাউডাংগ ইন টেইল।"

সারা উঠোনে ডালবাটা ছত্রখান হয়েছিল। এখানে সেখানে ডালবাটায় কাকের পায়ের ছাপ। এতক্ষণ সারা উঠোনে হুটোপাটা করে কাকটা পেঁপে গাছে বসে ঠোঁট দিয়ে তার গা পরিষ্কার করছিল।

বামাসুন্দরী হাতজোড় করে কাকটাকে প্রণাম করে বললেন, "যাই, ঠাকুরঝি আজ আবার কী কাণ্ড বাধালে দেখে আসি। আছাড় খেতে পারেও বটে মানুষটা, আমাদের এত বয়স হল, এখনও তো অত আছাড় খেতে পারি না।"

সতীশ ভরদ্বাজ গম্ভীরভাবে বারান্দার চেয়ারে বসে পুজোর চাল-কলার পেতলের রেকাবিখানা টেবিলের ওপর রেখে খবরের কাগজটা পড়ছিলেন। তারপর শব্দ করে খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন, "জিনিসপত্রের দাম ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ বৃদ্ধি পাইলে গরিব মনুষ্যেরা কী করিয়া প্রাণধারণ করিবে, কাহার কাছে হাত পাতিবে? হ্যাঁ, ঠিকই তো, ইয়ার্কি পেয়েছ নাকি? ইহারা কী করিয়া ইয়ে করিবে?"

ঠাকুরমশাই একটু অন্যরকম করে কাগজ পড়েন। বেশ বসে জোরে জোরে খবর পড়ছেন, পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে তার ভিতরেই নানারকম মন্তব্য করতে থাকেন। শুনলে মনে হয় যেন ওসব কথাও কাগজে ছাপা আছে।

যেমন তিনি এখন পড়ছেন, "কালিচরণ সাধুকে পুলিশ দায়রায় সোপর্দ করিয়াছে। সে নাকি পঞ্চবর্ষীয়া এক বালিকার কান হইতে দুল ছিনাইয়া লইয়া...ইস, ছিঃ ছিঃ—বালিকাটির কান কাটিয়া প্রবল রক্তপাত হইতে থাকে...চামারটাকে জুতোপেটা করতে হয়।...দুই দলের খেলায় কেহই গোল করিতে পারে নাই—তা পারবে কেন, অপদার্থ সব। সিমলায় প্রচণ্ড তুষারপাত...উঃ হুঁঃ হুঁঃ হুঁঃ, বরফ বড় ঠাণ্ডা রে বাপ! মুরগিহাটায় জোড়া খুন...ছুরিকাঘাতে...বাবারে, ছুরি যখন কচ্ করে শরীরে ঢোকে তখন না জানি কেমন লাগে!"

ঠিক এসময়ে ঝপাত করে কাকটা নেমে এল বারান্দার রেলিঙে। বসে ডাকল, কা?

ঠাকুরমশাই কাগজটা নামিয়ে ডবল পাওয়ারের চশমার ওপরের অংশটা দিয়ে কাকটাকে দেখে বললেন, "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ? তোমার স্ত্রীই বা কোথায় ছেলেপুলেই বা কোথায়? পশুপাখির আত্মীয়স্বজন থাকে না। বড় হতভাগ্য হে তোমরা।" বলে খবরের কাগজটা ফের তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন "বর্ধমানে বড় কাকের উৎপাত বাড়িয়াছে। এই কাকগুলি কিছু অন্যরকম। সাধারণ কাক নয়। গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকিয়া ইহারা দিনে ডাকাতি করিতেছে..."।

কাকটা ডাকল, কঃ।

ঠাকুরমশাই ফের কাকটার দিকে চেয়ে বললেন, "কস্তং? কে তুমি? কোত্থেকে আসছ? বর্ধমান নয় তো? তোমার ভাব সাব ভাল ঠেকছে না হে! গচ্ছ, গচ্ছ।"

কাকটা একটু কাসির শব্দ করে বলল, "ক্যায়াও?"

"ঝোলালে। ক্যায়াওটা আবার কী?"

কাকটা এক লাফে টেবিলের ওপর চলে এল। তারপর চোখের সামনে, হাতের নাগালে বসে টাউ-টাউ করে চালকলা খেতে লাগল।

ঠাকুরশাই তেড়ে গিয়ে বললেন, "হুশ্।"

কাকটাও চাল ঠুকরে দিতে এসে বলল, 'কবয়ঃ।"

সতীশ ভরদ্বাজ পিছিয়ে এলেন।

"কবয়ঃ?" ঠাকুরমশাই বললেন, "এ তো বিশুদ্ধ সংস্কৃত।"

'কয়।" কাকটা বলল।

ঠাকুরশাইয়ের হাত থেকে কাগজটা খসে পড়ে গেল। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন, এতক্ষণে ধরে যা হচ্ছে তা খুব সাধারণ ঘটনা নয়। বামাসুন্দরীকে ভয় খাওয়ানোর জন্য যা বানিয়ে বলেছিলেন তাই বুঝি সত্যি হল! তিনি হঠাৎ হাউ মাউ করে দৌড়ে গিয়ে উঠোনের ওপাশে বৈজ্ঞানিক হারাধনের ল্যাবরেটরিতে ঢুকে টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। সেখানে একটা উপুড় করা গামলার মতো কী-এক যন্ত্র, সেটা ছোঁয়ামাত্র ঠাকুরমশাইয়ের গা কাঁটা দিয়ে উঠল, মাথার চুল এমন কী টিকিটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গেল। শরীরে একটা শিরশির ভাব।

টেবিলের ওপাশ থেকে হারাধন গম্ভীরভাবে বলল, "সাকসেসফুল।"

"কী বাবা, কী সাকসেসফুল?"

"স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি। এতক্ষণ এটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম।"

মনোজের মেজকাকা ভজহরি বাজার করার ব্যাপারে খুব পাকা লোক। সবাই বলে, ভজবাবুর মত বাজাড়ু দুনিয়ায় দুটো নেই। বাজারের যত ব্যাপারী আর দোকানদার বাজাড়ু ভজহরিকে দেখলেই ভয় খায়। যে তে-এঁটে সবজিওলা সকাল থেকে ফুলকপির দর দেড় টাকার এক পয়সা নীচে নামায়নি, সে পর্যন্ত বাজাড়ু ভজবাবুকে দেখলে নার্ভাস হয়ে নিজে থেকেই 'পাঁচসিকে' বলে ফেলে। যে-সব দোকানদার গোলমেলে দাঁড়িপাল্লা বা বাটখারা দিয়ে ওজন করে, তারা ভজবাজাড়ুর গন্ধ পেলেই সব সরিয়ে ফেলে ভালমানুষ সাজে। অবশ্য ভজবাবু কখনও দোকানদারের দাঁড়িপাল্লা বা বাটখারায় মেপে জিনিস কেনেন না, তাঁর সঙ্গে সবসময়ে নিজস্ব দাঁড়িপাল্লা এবং বাটখারা থাকে। রান্নার ঠাকুর গুঁফো মিশির আর চাকর রঘু সেসব বাজারে বয়ে নিয়ে যায়।

ভজবাবুর বাজার করার কায়দা একটু অন্যরকম। সে-কায়দাটা এমনই অদ্ভুত যে অন্য খদ্দেররা নিজেদের বাজার করা বন্ধ রেখে ভজবাজাড়ুর বাজার করা হাঁ করে দেখে।

যেমন আজ টমেটোওলা ভজবাবুকে দেখে খুব বিনয়ী হাসি হেসে এক গালের পান অন্য গালে নিয়ে আড়াই টাকার টমেটোর দাম ন' সিকে চেয়ে বলল, "আপনি বলেই চার আনা ছেড়ে দিলাম।"

ভজবাবু নির্নিমেষলোচনে টমেটোওলার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। পাড়ার থিয়েটারে কেপুবাবু সিরাজদ্দৌলা সেজে মহম্মদী বেগ-এর হাতে ছোরা খেয়ে যেমনভাবে চেয়েছিলেন (সে-দৃশ্যে যে হাততালি পড়েছিল তা দু মাইল দূর থেকে শোনা যায়) ঠিক তেমনি চোখের দৃষ্টি ভজবাবুর। সেই চোখ দেখে

টমেটোওলার রক্ত জল হয়ে যেতে লাগল। মিনমিন করে সে আরও দু আনা ছেড়ে বলল, "ঠিক আছে ভজবাবু, না হয় দু আনা কম দেবেন।"

ভজবাবু সে-কথার উত্তর দিলেন না। তাঁর থমথমে মুখচোখ ক্রমে লাল হয়ে উঠেছিল। চোখ দুটো স্থির, নাকের পাটা কাঁপছে। এক পাশে বেগুন দর করতে করতে, অন্য পাশে পালং শাক থলিতে ভরতে ভরতে দুজন-চারজন করে লোক এগিয়ে এসে আশেপাশে দাঁড়িয়ে গেল। ভজবাবুর পার্ট দেখবে।

ভজবাবুর ঠোঁট কেঁপে উঠল, ফিসফিস করে প্রথমে বললেন, "মহাপাপ!"

কথা শোনার জন্য দু-চারজন কান এগিয়ে আনল।

ভজবাবু এবার আর-একটু জোরে বলে উঠলেন, "মহাপাপ!"

সেই গম্ভীর ধ্বনি শুনে টমেটোওলার মুখ শুকিয়ে গেল।

পরক্ষণেই ভজবাবু হঠাৎ দু হাত লাফিয়ে উঠে বিকট হুংকার ছাড়লেন, "মহাপাপ! মহাপাপ! মহাপাপ।"

যারা কান এগিয়ে এনেছিল, তারা এই বিকট শব্দে কান চেপে ধরে পাঁচ হাত করে পিছিয়ে গেল।

ভজবাবু লাফাচ্ছেন আর হুংকার দিচ্ছেন, "মহাপাপ! পৃথিবী রসাতলে যাবে। তারপর টমেটোওলার দিকে আঙুল তুলে চেঁচাতে লাগলেন, "তুইও রসাতলে যাবি। এখনও সময় আছে, বল ঠিক করে।"

টমেটোওলা নিথর হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ চোখে মুছে ধরা গলায় বলল, "সাত সিকে। দিন বাবু, আপনার দাঁড়িপাল্লা দিন।"

ভজবাবু সব জায়গায় এক কায়দা খাটান না। তা হলে আর বাজাড়ু হিসেবে তাঁর অত নাম-ডাক কিসের?

টমেটোওলাকে কাঁদিয়ে তিনি পালং শাক বেচতে-আসা একটা ছোট মেয়ের ঝুড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। মেয়েটার বয়স দশ বছর হবে। পান-খাওয়া রাঙা ঠোঁট চেপে খুব গম্ভীরমুখে নাকে নোলক দুলিয়ে বসে ছিল।

ভজবাবু তার সামনে উবু হয়ে বসে মুখের দিকে চেয়ে ভারী মোলায়েম হেসে ছড়া কাটার মতো সুর করে বলতে লাগলেন, "ও খুকি, তুমি পান খেয়েস? বাঃ বাঃ, পান খেয়েস! নাকে নোলক মুখে পান, জয় জয় বলো জয় ভগবান।"

মেয়েটা ভয় পেয়ে খুব সন্দেহের চোখে ভজবাবুকে দেখতে থাকে।

ভজবাবু মাথা নেড়ে নেড়ে বলেন, "খুকি নোলক পরেসে, খুকি পান খেয়েসে। খুকি নোলক পরেসে, খুকি পান খেয়েসে। পালং শাক কত করে গো খুকি?"

মেয়েটা মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, "টাকা টাকা।"

ভজবাবু মুখখানা ভার করে বললেন, "পান খাওয়ার কথায় রাগ করলে খুকুসোনা? এমাঃ, রাগ করলে! পালং কখনও এক টাকা হয়?"

মেয়েটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, "বাবা বলে গেছে, এক টাকার কমে কাউকে বেচবি না।"

ভজবাবুর দুচোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়লে লাগল। হাপুস চোখে কেঁদে ভজবাবু বললেন, "ও খুকি, তুই আমার ওপর রাগ করলি শেষে! পান খাওয়ার কথা বললাম বলে রাগ করলি?"

কান্নাকাটি দেখে ছোট মেয়েটা ঘাবড়ে গিয়ে দিশেহারার মতো বলে ফেলে, 'তা আমি কী করব? বাবা বলে গেল যে!"

ভজবাবু চোখ মুছে ধরা-গলায় বলেন, "তুই বুঝি বাপের সব কথা শুনিস খুকি? চুরি করে তেঁতুল খাস না? নতুন জামার জন্য বায়না করিস না? কাজের সময়ে পালিয়ে খেলতে যাস না?"

মেয়েটা ফিরিক করে হেসে বলল, "আচ্ছা, বারো আনা করে দাও।"

মেছোবাজারের কানাই মাছওলা বড় ভয়ংকর লোক। সবাই জানে, কানাই দিনে মাছ বেচে, রাতে ডাকাতি করে। গুলিপাকানো বিশাল চেহারা তার, চোখ দুখানা সবসময়ে গাঁজাখোরের মতো লাল, খদ্দেরদের সঙ্গে ধমক-ধামক দিয়ে কথা বলে। আধমন একমন ওজনের বড় বড় মাছ হেলাফেলায় তুলে ভচাং ভচাং করে কেটে ফেলে লহমায়। বুকের পাটা না থাকলে কেউ কানাইয়ের সঙ্গে দরাদরি করতে যায় না।

কানাইয়ের দোকানে আজ মস্ত মস্ত কইমাছ। দূর থেকে ভজবাজাড়ুকে দেখেই কানাই তড়িঘড়ি কইমাছগুলোকে গামছা-চাপা দিয়ে রাখল। পনেরো টাকা দর দিয়ে রেখেছে, ভজবাবু দেখলেই দশ টাকায় নামিয়ে ফেলবে। তার চেয়ে চেপে রাখা ভাল।

কিন্তু কইমাছ চাপা কি সোজা! তারা লাফায়, হাঁটে, ছোটে। গামছায় চাপা কইমাছেরা গামছাটা ছেঁড়ার জোগাড় করে তুলল।

ভজবাবু এসে গম্ভীরমুখে বললেন, "গামছাটা কত দিয়ে কিনেছিলি?"

কানাই মাথা চুলকে বলে, "কত আর! তিন টাকা বোধ হয়।"

ভজবাবু তেমনি গম্ভীর মুখে বলেন, "মাছের দামের সঙ্গে গামছার দামটা যোগ করে বল কইমাছের দর কত।"

কানাই মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলল, "ও মাছ বিক্রি হয়ে গেছে, তাই ঢেকে রেখেছি।"

"কে কিনেছে?"

কানাই অন্যদিকে চেয়ে বলল, "দারোগাবাবু।"

এ সব চালাকি ভজবাবু জানেন, তাই একটুও না ঘাবড়ে বললেন, "আমি তো থানার কাছ দিয়েই যাব। মাছগুলো দিয়ে দে বরং, পৌঁছে দিয়ে যাবোখন। দারোগাবাবু আবার নিশিকান্তপুরের ডাকাতির ব্যাপারে আমার পরামর্শ চেয়েছিলেন।"

কানাইয়ের মুখের চেহারা পালটে যায়। পনেরো টাকার মাছ সে তখন বারো টাকায় ছাড়তে রাজি। নিশিকান্তপুরের ডাকাতিটা নিয়ে হইচই করছে পুলিশ।

ওর মুখের চেহারা দেখে ভজবাবু বুঝতে পারলেন যে, কানাইকে এবার বাগে পাওয়া গেছে। জজ যখন আসামীর ফাঁসির হুকুম দেয়, তখন যেমন গম্ভীর-করুণ মুখের ভাব করে, ঠিক তেমনি মুখ করে ভজবাবু কানাইয়ের দিকে চেয়ে আছেন। তা দেখে কানাইয়ের বুক কেঁপে ওঠে। সে ভয়ে-ভয়ে বলে, "দারোগাবাবু বোধহয় মাছের কথা ভুলেই গেছেন। আপনি যখন বলছেন—"

ভজবাবু ইঙ্গিতে রঘু দাঁড়িপাল্লা আর গুঁফো মিশির বাটখারা বের করে ফেলেছে। ঠিক এ-সময়ে একটা বাধা পড়ল।

হয়েছে কী, গোয়েন্দা বরদাচরণ আর তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাগ্নে চাক্কুও বাজারে এসেছে। সবাই জানে, ভজবাবু বাজারে এলে সব জিনিস সস্তা হয়ে যায়। তাই ভজবাবুর পিছু পিছু বাজার করার জন্যে অনেকেই তক্কে তক্কে

থাকে। যেই ভজবাবু আড়াই টাকার মাল সাত সিকেতে কিনে নেন অমনি অন্য বাজাড়ুরা সেই দোকানিকে ছেঁকে ধরে সব মাল সাত সিকে দিয়ে চিলু-চিলু করে কিনে নেয়। বরদাচরণও সেই দলের।

বরদাচরণ কইমাছ বড় ভালবাসেন। এ-বছর এখন পর্যন্ত কইমাছ খাওয়ার ভাগ্য তাঁর হয়নি। আজই প্রথম কানাই-মাছওলা কইমাছ নিয়ে বসেছে। অথচ বরদাবাবুর কিছু করারও নেই, কারণ বাজাড়ু ভজহরি মাছগুলিকে প্রায় গ্রেফতার করে ফেলেছেন। তাই গোয়েন্দা বরদাচরণের মুখটা খুবই বিষণ্ণ হয়ে গেল।

ভাগ্নে চাক্কু ব্যাপারটা লক্ষ করে খানিক ভেবে নিয়ে মামার কানে-কানে কী যেন একটু বুদ্ধি দিল। তখন মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বরদাচরণের।

তিনি কাঁচুমাচু মুখ করে ভজবাবুর কাছে গিয়ে খুব কুণ্ঠিত গলায় বললেন, “ভজহরিবাবু, একটু কথা ছিল।”

বাজার করার সময়ে ভজবাবু তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসেন না। ওস্তাদ কালোয়াত যেমন গানের সময়ে কেবল তবলচি বা তানপুরোওলা ছাড়া জগতের আর সব ভুলে যায়, ভজবাবুও বাজার করার সময়ে দোকানদার ছাড়া আর কাউকে মনে রাখতে চান না। বাজার করাটাও একটা আর্ট, আর আর্টের সময়ে কে ভ্যাজাল পছন্দ করে?

বিরক্ত ভজবাবু বলেন, “কথার আর সময় ছিল না? কইমাছগুলো, তুলছি, ঠিক এই সময়েই যত কথা!”

বরদাচরণ গম্ভীর হয়ে বললেন, “রাগ করবেন না ভজবাবু। আপনার বাড়িতে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।”

“অ্যাকসিডেন্ট!” ভজবাবুর হাত থেকে একটা মাছ লাফিয়ে পালিয়ে গেল। সেটাকে সাঁ করে ধরে ট্যাঁকে গুঁজে ফেলল কানাই। যা বাঁচানো যায়।

বরদাচরণ বিষণ্ণমুখে বললেন, “খুব খারাপ ধরনের অ্যাকসিডেন্ট। বাজারে আসবার পথে আপনার বাড়ির পাশ দিয়ে যখন আসছি তখন শুনি, ভিতরবাড়িতে তুমুল চেঁচামেচি হচ্ছে। বহু লোক ভিড় করেছে। আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে যান।”

ভজবাবু আর কইমাছের দিকে ফিরেও চাইলেন না। ‘সর্বনাশ’ বলে চেঁচিয়ে উঠে বাড়িমুখো ছুটতে লাগলেন।

ভজবাবু বাড়ির কাছাকাছি যখন এসে পড়েছেন তখন শ্রুতিধর ঘোষ আর ফচকে-ফটিকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। শ্রুতিবাবু একগাল হেসে ভজবাবুকে বললেন, “পড়ে গেছেন।”

হন্তদন্ত ভজবাবু আঁতকে উঠে বললেন, “মরে যায়নি তো?”

শ্রুতিবাবু একটু চিন্তা করে বললেন, “না বোধহয়।”

তখন ভজবাবুর মাথায় আর-একটা প্রশ্ন এল, উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, “কে পড়েছে বলুন তো!”

“পিসিমা।”

খুব হতাশ হয়ে ভজবাবু বললেন, “ওঃ! তাই বলুন।”

শ্রুতিবাবু খুব হেসেটেসে বললেন, “গণেশবাবু গরুর দড়ি চুরি করেছিলেন ফাঁসি যাওয়ার জন্য। ধরা পড়ে খুব নাকাল হচ্ছেন রাখোবাবুর কাছে। রাখোবাবু বলেছেন, এবার থেকে যেন গণেশবাবু ফাঁসি যাওয়ার জন্য নিয়মিত বাজার থেকে নতুন দড়ি আনিয়ে নেন।”

ভজবাবু বললেন, “আর কিছু হয়েছে?”

শ্রুতিবাবু একটু চিন্তা করে বললেন, "হয়েছে। কিন্তু কী যেন! ফটিক, কী যেন...ইলেকট্রিক দিয়ে কী যেন হল...!"

ফটিক বলল, "পুরুতমশাই শক খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ।" শ্রুতিবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, "আর, দুঃখবাবুকে মনোজ ঠাকুরঝির ইংরিজি জিজ্ঞেস করেছিল, দুঃখবাবু পারেননি।"

"আর কিছু?"

"আরও চান?" শ্রুতিবাবু ভারী অবাক হয়ে বলেন।

ফটিক বলে, "আরও একটা আছে।"

"কী যেন?" শ্রুতিবাবু বলেন।

"সেই যে কাকটার কথা। " ফটিক মনে করিয়ে দিল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা কাক।"

ভজবাবু আর দাঁড়ান না, দৌড়ে বাড়ির দিকে এগোতে থাকেন।

এদিকে ততক্ষণে ঠাকুরঝিকে গোবর থেকে তুলে স্নান করানো হয়েছে। সতীশ ভরদ্বাজ জ্ঞান হয়ে উঠে বসে গরম দুধ খাচ্ছেন। দুঃখবাবু তাঁর ঘরে বসে ডিকশনারি খুলে প্রাণপণ খুঁজে 'ঠাকুরঝি' শব্দের ইংরিজি খুঁজে পাচ্ছেন না। সরোজ একবার সিস্টার-ইন-ল বলায় ভারী রেগে গিয়েছিলেন তার ওপর। গণেশবাবু নিজের ঘরে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছেন। রামু চশমা-চোখে হারিকেনকে খুঁজেতে বেরিয়েছিল, খুব ঠাহর করে দেখে সে মাঠ থেকে হরশঙ্কর গয়লার একটা মোষকে ধরে এনে চুপিসাড়ে গোয়ালে বেঁধে রেখে এখন কদমগাছের তলায় বসে কাঁচা মুলো দিয়ে মুড়ি খাচ্ছে। রাখোবাবুর অফিস যাওয়ার সময় হয়েছে, কিন্তু হঠাৎ খেয়াল করে দেখেন, স্নানের আগে যখন গেঞ্জি ছেড়েছেন তখন সেই গেঞ্জির সঙ্গে গলার পৈতে খুলে গেছে। কিরমিরিয়া গেঞ্জি কেচে শুকোতে দেওয়ার সময়ে বাজে সুতো ভেবে সেটা কোথায় গুটলি পাকিয়ে ফেলে দিয়েছিল, বজ্জাত সেই কাকটা পৈতে মুখে নিয়ে পেঁপে গাছে গিয়ে বসে ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, পৈতেটা কাকের গলায় ঝুলছে। তাই দেখে মনোজের ঠাকুমা রেকাবিতে নৈবেদ্য সাজিয়ে পেঁপেতলায় রেখে প্রণাম করছেন। গলায় পৈতে না থাকায় রাখোবাবু কথা বলতে পারছেন না, কিন্তু বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে মুখ নেড়ে ভয়ংকর রাগারাগি করছেন, আর হাত-পা ছুড়ছেন। মুখের নানারকম ভঙ্গিতে কখনও 'গাধা' কখনও 'গরু', কখনও 'বোকা' শব্দগুলি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি।

বাবা কখন কী বলছে তাই নিয়ে মনোজ, সরোজ আর পুতুল উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে বাজি ধরছে। যেমন, একবার রাখোবাবু মুখটা অ্যা-এর মতো করে আবার উ-এর মতো করায় সরোজ বলল, "এখন বাবা ঘেউ করল।"

পুতুল বলে, "দূর! ও তো কুকুরের ডাক। বাবা বলল, ধ্যাততেরি।"

"মোটেই না।" মনোজ বলে, "বাবা ওভাবে ঢেকুর তোলে।"

রাখোবাবু আ করে একটা ই করলেন।

মনোজ বলল, "পাজি।"

পুতুল বলে, "উহুঁ। 'হায় এ কী' বলল বাবা।"

সরোজ বলল, “না। বাবা আমাদের বাড়ি থেকে বেরোতে বলছে।”

ব্যায়ামবীর এবং বৈজ্ঞানিক হারধন ভূতে বিশ্বাস করে না। বাড়িতে নানারকম চেঁচামেচি শুনে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এসে সব ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করছিল। কিরমিরিয়া গিয়ে তার পা ধরে কাঁদতে বসল, “ও হারাদাদাবাবু গো, বাড়িতে এ-সব কী হল গো? একটা কাকভূত এসে বড়দাদাবাবুর পৈতে নিয়ে গেল গো। বড়দাদাবাবু কথা বলতে পারবে গো?”

হারাধন কাকটার দিকে চেয়ে বলল, “কাকভূত! কাকভূত! কথাটা কেমন চেনা-চেনা ঠেকছে! অনেকটা চাগম কিংবা লামড়োর মতো!”

এখন হয়েছে কী, হারাধন শুধু ব্যায়ামবীর নয়। সে ব্যায়াম জানে, কুস্তি, বকসিং, জুডো, কারাটে জানে। আবার বৈজ্ঞানিক হিসাবেও রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, বলবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি সব কাজের কাজী। তার গবেষণাগারের পিছনে উদ্ভিদবিদ্যার নানারকম পরীক্ষা চালানোর একটা আলাদা বাগান আছে। সেখানে অনেকগুলো কিম্ভুত গাছ রয়েছে। তার মধ্যে একটা আছে চাগম গাছ, আর একটা লামড়ো। অর্ধেক ধান আর অর্ধেক গমের বীজকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জুড়ে দিয়ে একটা সংকর বীজ তৈরি করে সে তার নাম দিয়েছে চাগম। অর্ধেক লাউবিচির ঙ্গে অর্ধেক কুমড়োবিচি জুড়ে হয়েছে লামড়ো গাছের বীজ। চাগম আর লামড়ো দুটো বীজ থেকেই গাছ বেরিয়েছে বটে, তবে তাতে এখনও কোনও ফসল ধরেনি। চাগম বা লামড়ো কেমন হয় তা জানবার জন্য শহরসুদ্ধু লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

হারাধনের পা ধরে কিরমিরিয়া বিলাপ করছে, “বাড়িতে কাকভূত থাকলে আমি মরে যাব গো। ও হারাদাদাবাবু, আমি মরে গেলে তোমার চাগম দিয়ে লামড়োর ঘণ্টা কে চেখে দেখবে গো?’

হারাধন গম্ভীরভাবে কিরমিরিয়ার হাত থেকে পা ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের বাগানের দিকে চলে যেতে যেতে বলল, “ওটা কাকভূত নয় রে কিরমিরিয়া। ওটা হয় কাক, না হয় তো ভূত।”

সতীশ ভরদ্বাজ একটা সুস্থ হয়ে বসে রাখোবাবুর জন্য নতুন পৈতে গ্রন্থি দিচ্ছিলেন। শেষ গ্রন্থিটা দিতে দিতে গম্ভীর গলায় বললেন, “ভূত।”

রাখোবাবু সতীশ ভরদ্বাজের হাত থেকে পৈতেটা কেড়ে নিয়ে গলায় পরেই বললেন, “কাক।”

সতীশ ভরদ্বাজ মাথা নেড়ে বললেন, “ভূত। ওকে আমি বিশুদ্ধ সংস্কৃত বলতে শুনেছি নিজের কানে।”

রাখোবাবু বললেন, “কাক। নোংরা, বজ্জাত, পাজি, ছুঁচো একটা কাক। নিজের চোখে দেখেছি।”

সতীশ ভরদ্বাজ বললেন, “ভুল দেখেছেন।”

রাখোবাবু বললেন, “ভুল শুনেছেন।”

সতীশ ভরদ্বাজ বললেন, “না।”

রাখোবাবু বললেন, “আমারও ওই এক কথা। না।”

সতীশ ভরদ্বাজ বললেন, “ওটা যে ভূত নয় তা প্রমাণ করতে পারেন?”

“করছি।” বলে রাখোবাবু পেল্লায় চেঁচিয়ে ডাকলেন, “মনোজ।”

মনোজ গুটিগুটি এগিয়ে বলল, “কী?”

“তোর গুলতিটা নিয়ে আয় তো। কয়েকটা বেশ ভারী দেখে পাথরও আনিস। কাকটার উচিত-শিক্ষা হওয়া উচিত।”

মনোজ দৌড়ে তার গুলতি আর কয়েকটা পাথর নিয়ে এল। রাখোবাবু বড়সড় একটা পাথর গুলতিকে ভরে টিপ করতে লাগলেন। মনোজের ঠাকুমা যে নৈবেদ্য রেখে গেছেন কাকটা উঠোনে নেমে এসে তা খাচ্ছিল। মনোজ, সরোজ আর পুতুল বাবার হাতের টিপ দেখবে বলে দম বন্ধ করে আছে।

সরোজ বলল, "বাবা ঠিক লাগাবে।"

মনোজ বলল, "পারবে না।"

পুতুল বলল, "তিন বারে পারবে।"

ঠিক এই সময়ে পেঁপে গাছের পিছনের দেয়াল টপকে একটা টুপিওলা মুখ উকি মারল।

সরোজ মনোজ একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, "চাক্কুদা!"

রাখোবাবু কাকটাকে টিপ করতে করতে বিরক্ত হয়ে বললেন, "কাজের সময়ে বড় বিরক্ত করিস তোরা। আর এ কাকটাও অসম্ভব বজ্জাত। কিছুতেই এক জায়গায় স্থির হয়ে বসছে না।"

চাক্কু খুব ভাল ফুটবল ক্রিকেট খেলে, জুড়ো জানে, বকসিং করে। ব্যায়াম আর প্যাঁচ শিখতে সে রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যায়ামবীর হারাধনের কাছে আসে। তাকে যে লুকিয়ে আসতে তার কারণ চাক্কুর মামা গোয়েন্দা বরদাচরণের সঙ্গে মনোজের কাকা হারাধনের একেবারেই সদ্ভাব নেই। হারাধন আর বরদাচরণ কেউ কাউকে দেখতে পারেন না।

হারাধনের নাম শুনলে বরদাচরণ বলেন, "বৈজ্ঞানিক? হুঁ!"

আশ্চর্য এই, বরদাচরণের নাম শুনলে হারাধনও অবিকল একই সুরে বলেন, "গোয়েন্দা!হুঁঃ!"

বরদাচরণও কুস্তি, বকসিং, জুডো ইত্যাদি নাকি ভালই জানেন। তবে এ-সব ব্যাপারে বরদা আর হারার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তার কোনও মীমাংসা হয়নি।

চাক্কু দেয়ালের ওপর মুখ তুলে বাড়ির ভিতরটা ভাল করে দেখে নিয়ে মুখে আঙুল পুরে দুটো অদ্ভুত শিস দিল। শিসের শব্দ হতে-না-হতেই দেয়ালের ওপর বরদাচরণের মুখখানা ভেসে উঠল এবার। তিনিও বাড়ির ভিতরটা দেখতে লাগলেন।

সরোজ মনোজ ফের চেঁচাল, "গোয়েন্দাকাকু!"

রাখোবাবু মনোজ ফের চেঁচাল, "গোয়েন্দাকাকু!"

রাখোবাবু চাক্কু বা বরদাচরণকে লক্ষই করেননি। তিনি অতি নিবিষ্ট মনে গুলতির তাকের মধ্যে কাকটাকে আনবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু নচ্ছার কাকটা কিছুতেই স্থির থাকছে না, কেবল লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। সরোজ-মনোজের চেঁচামেচি শুনে বিরক্ত রাখোবাবু বললেন, "আঃ, একটু চুপ করবি তোরা? কনসেনট্রেশন নষ্ট করে দিলে লোকে কী করে জরুরি কাজ করবে? যতক্ষণ কাকটার গায়ে না লাগছে ততক্ষণ আমি অফিস যাব না বলে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছি।"

কাকমারা ভুলে গিয়ে সরোজ মনোজ পুতুল তখন হাঁ করে দেখছে, গোয়েন্দা বরদাচরণ আর চাক্কু দেয়ালের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে।

দুজনের দেয়াল টপকানো দেখে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই সাধারণত গোয়েন্দা বরদাচরণ কখনও সদরদরজা দিয়ে ঢোকেন না। তাতে নাকি গোয়েন্দার বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়, লোকে গোয়েন্দা বলে খাতির করে না। গোয়েন্দাদের আচার-আচরণে একটা রহস্যময়তা না থাকলে লোকে সেই গোয়েন্দাকে মানবেই বা কেন? গোয়েন্দারা কখনও সহজ পথে চলবেন না, সহজ পথে ভাববেন না, সহজ চোখে চাইবেন না। সব সময়ে এমন আচরণ করবেন যাতে লোকে চমকে, আঁতকে, ভয় খেয়ে বা ভিরমি খেয়ে যায়। তাই গোয়েন্দা বরদাচরণ বেশির ভাগ বাড়িতেই দেয়াল টপকে, জানালার শিক বেঁকিয়ে ঢোকেন। শোনা যায়, এক বাড়িতে নাকি সিঁধ কেটেও ঢুকেছিলেন।

তবে চেনাজানা লোকের বাড়ি না-হলে তিনি এতটা করেন না।

যাই হোক, বরদাচরণ দেয়ালের ওপর উঠে গলা থেকে ঝোলানো একটা বাইনোকুলার তুলে চোখে লাগিয়ে চারদিক দেখছিলেন। তাঁর সেই দেখা আবার দেখছিল সরোজ, মনোজ পুতুল, সতীশ ভরদ্বাজ। আর ঠিক সেই সময়ে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে ঠাকুরঝি ভেজা পায়ে আর একবার পড়ি-পড়ি করেও সামলে গিয়ে দাঁড়িয়ে চাক্কু আর বরদাচরণকে দেখতে পেলেন।

রাখোবাবু কাকটার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "কেউ কি নেই যে কাকটাকে এক জায়গায় একটু ধরে রাখবে স্থির করে?"

কাকটার খাওয়া হয়ে গেছে। এবার সে একটা উড়াল দিয়ে ফের পেঁপে গাছটায় বসল। রাখোবাবু বললেন, "এই বার। এইবার!"

বলতে বলতে পেঁপে গাছের দিকে কাকটাকে টিপ করতে গিয়ে তিনি দেয়ালের ওপর মামা-ভাগ্নের মূর্তি দেখে চমকে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে বললেন, "কে রে? অ্যাঁ? কার এই সাহস যে দেয়ালে উঠেছিস?"

তাক করা গুলতি দেখে, আর সেই গর্জন শুনে তৎক্ষণাৎ চাক্কু পচাং করে দেয়ালের ওপিঠে লাফিয়ে পড়ল। বরদাচরণ তা পারলেন না। চাক্কু ছেলেমানুষ, সে হালকা শরীরে যত লাফ-ঝাঁপ করতে পারে, বরদাচরণ তা পারেন না। এ বয়সে লাফ-টাফ দিলে হাত-পা ভাঙতে পারে। তবে তিনি বাইনোকুলারটা ফেলে দুটো হাত ওপর দিকে তুলে বলে উঠলেন, "সারেন্ডার! গুলতি ছুড়বেন না। আমি বরদাচরণ।"

"ও বরদাবাবু।" বলে রাখোবাবু গুলতি নামিয়ে নিলেন। বললেন, "কী খবর?"

"খবর খুব সাঙ্ঘাতিক, আমি একটা তদন্তে এসেছি।"

“তদন্ত! কিসের তদন্ত মশাই?”

“বলছি।” বলে বরদাচরণ দেয়াল থেকে নামবার উপায় খুঁজতে থাকেন। দেয়ালটা মস্ত উঁচু, চাক্কু লাফ দিলেও বরদাচরণ তা করতে ভরসা পান না। তাই খুব সাবধানে দেওয়ালের ওপর দিয়ে হেঁটে পেঁপে গাছটার কাছ-বরাবর যেতে থাকেন। ইচ্ছে, পেঁপে গাছ বেয়ে নেমে আসবেন।

সতীশ ভরদ্বাজ বলে ওঠেন, “উঁহু, উঁহু, বড় নরম গাছ ভেঙে যাবে। গাছে আবার কাকভূতও বসে আছে।” রাখোবাবু বললেন, “ভূত নয়। কাক।”

সতীশ ভরদ্বাজ বললেন, “ভূত।”

“কাক।”

“ভূত।”

“কাক।”

“ভূত।”

কিন্তু মীমাংসা হল না বলে দুজনেই দুজনের দিকে খানিক কটমট করে চেয়ে রইলেন।

ওদিকে, বরদাচরণ কাকটার কথা জানতেন না, পেঁপে গাছের সহনশীলতা সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান নেই। যেই পেঁপে গাছের ডগাটা ধরতে গেছেন অমনি ভুতুড়ে কাকটা বলে উঠল, “খাওরখার!’

“উঁ।” সতীশ ভরদ্বাজ বলেন, “শুনলেন তো! পরিষ্কার বলল—খবরদার।”

রাখোবাবু বলেন, “ওটা কাকের ডাক।”

বরদাচরণ কাকটাকে বললেন, “হুশ! হুশ?”

কাক বলল, “ক্যা?”

বরদা বললেন, “চোপরাও কেলেভূত। পালা! যাঃ, যাঃ!”

কাক বলল, “কটর, কটর।”

সতীশ ভরদ্বাজ বললেন, “শুনুন। বলছে, কেটে পড়, কেটে পড়।”

বরদাচরণ তখন ট্যাঁক থেকে রিভলবার বার করে ফেলেছেন। কাকটাকে শাসিয়ে বললেন, “দেব খুলি উড়িয়ে? যাঃ বলছি!”

কাকটা হুড়ুশ করে উঠে বরদাচরণের মাথায় একটা রাম-ঠোক্কর মারল। বরদাচরণ পেঁপে গাছের ডগাসুদ্ধু ভেঙে নিয়ে হড়াস করে উঠোনে পড়লেন। সেই শব্দে বাড়িময় দৌড়োদৌড়ি চেঁচামেচি পড়ে গেল।

বামাসুন্দরী এসে বরদাচরণকে হাত ধরে তুলে বললেন, “কেন বাবা বরদা, সামনে সদর-দরজা থাকতেও দেয়াল টপকাতে গেলে?”

বরদাচরণ নিজের কোমর হাত দিয়ে মালিশ করতে করতে ব্যথার মধ্যেও বললেন, “তাতে কী মাসিমা, গোয়েন্দাদের কত রিস্ক নিতে হয়! এ তো দেয়াল থেকে পড়া দেখলেন, সিমলায় একবার পাহাড় থেকে পড়তে হয়েছিল। চলন্ত ট্রেন বা মোটর থেকেও কতবার লাফ দিয়েছি। গোয়েন্দাদের ব্যথা লাগে না।”

কাকটা আবার দেয়ালে বসেছে, গলায় পৈতে। বামাসুন্দরী তাকে আর-একবার নমস্কার করে ঘরে চলে গেলেন। রাখোবাবুও গুলতিটা নামিয়ে নিয়ে বললেন, “না, এ কাকটা খুবই ডেঞ্জারাস দেখছি! গুলতি মারলে হয়তো আবার রিভেঞ্জ নিতে তেড়ে আসবে।”

"তবে?" বলে সতীশ ভরদ্বাজ খুব সবজান্তা হাসি হাসলেন। বললেন, "সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণভূত।"

বরদাচরণের পিস্তলটা ছিটকে পড়েছিল জবা গাছের গোড়ায়। সরোজ সেটাকে কুড়িয়ে সুট করে মনোজের হাতে চালান দিল। মনোজ জামার তলায় লুকিয়ে নিয়ে পুতুলের হাতে পাচার করল। পুতুল সেটা নিয়ে নিজের পুতুলের বাক্সে ন্যাকড়া চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখে ভালমানুষের মতো মুখ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বরদাচরণের অবশ্য পিস্তলটার কথা খেয়াল হল না। পড়ে গিয়ে তাঁর ঘিলু নড়ে গেছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। নিতান্ত গোয়েন্দাদের অজ্ঞান হতে নেই বলে তিনি অজ্ঞান হননি। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে তিনি বারান্দায় রাখোবাবুর মুখোমুখি বসে বললেন, "ব্যাপারটা খুবই জরুরি এবং গোপনীয়! আমি একটা পুরনো ফোটোগ্রাফের সন্ধানে আপনার বাসায় এসেছি। একটা ছোট ছেলের ফোটোগ্রাফ।"

বরদাচরণের পড়ে যাওয়ার শব্দে দুঃখবাবু আর গণেশ ঘোষালও ছুটে এসেছিলেন। তেমন কিছু হয়নি দেখে তাঁরা হতাশ হলেন।

নিজেদের ঘরের দিকে যেতে যেতে গণেশবাবু বললেন, "আচ্ছা দুঃখবাবু, মোষের কি গোবর হয়?"

দুঃখহরণবাবু চিন্তিত হয়ে বললেন, "মোষের গোবর? কী জানি, ঠিক বলতে পারছি না। ষাঁড়ের গোবর বলে একটা কথা আছে বটে, কিন্তু মোষের গোবর কখনও শুনিনি। তবু চলুন, ডিকশনারিটা একবার ঘেঁটে দেখি।"

গণেশবাবু বললেন, "ডিকশনারি দেখতে হবে না। আমি আজ জানতে পেরেছি, মোষেরও গোবর হয়।"

"কী করে জানলেন?

গণেশবাবু বললেন, "আমার বাক্সের চাবি পৈতেয় বাঁধা থাকে। সকাল থেকে সেটা খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় হারাল তা খুঁজতে খুঁজতে শেষে গোয়ালে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। কী দেখলাম জানেন?"

"কী?"

"দেখি কি, গোয়ালঘরে একটা বিশাল চেহারার মোষ বাঁধা। মোষটা এক কাঁড়ি নেদে রেখেছে। আদ্যাশক্তিদেবী তো খুব গোবর ভালবাসেন, দেখলাম তিনি। একটা পেতলের গামলায় সেই নাদি দুহাত ভরে ভরে তুলছেন আর আপনমনে এক গাল হেসে-হেসে খুব আহ্লাদের সঙ্গে বলছেন—আহা, আজ একেবারে গোবরে-গোবরে ভাসাভাসি কাণ্ড। কত গোবর! জন্মে এত গোবর দেখিনি বাবা! গোবর দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, বুকটা ঠাণ্ডা হয়।"

"বটে?"

"তবে আর বলছি কী! পরিষ্কার দেখলাম মোষ। চোখ কচলে, নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখেছি, আমার দেখার ভুল নয়। হাতির মতো বিশাল, বিটকেল মোষ। আদ্যাশক্তিদেবী তার নাদি তুলতে তুলতে পরিষ্কার বললেন, "গোবর। তাই ভাবছি, মোষের গোবর হয় কি না! এখন মনে হচ্ছে, হয়।"

দুঃখহরণবাবু বললেন, "কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি। গোয়ালঘরে মোষটা এল কী ভাবে?"

গণেশবাবু বললেন, "আমি কিন্তু তা ভাবছি না। আজ এক আশ্চর্য জ্ঞান লাভ করে আমার মাথাটা ভরে গেছে। মোষেরও যে গোবর হয়, এ একটা নতুন আবিষ্কার। সেই গোবরের চিন্তায় আমার মাথা ভর্তি।"

দুঃখবাবু মাথা নেড়ে বলেন, "তা জানি। কিন্তু অন্য দিকটাও একটু খেয়াল করবেন। মোষটা হঠাৎ এল কোত্থেকে? আর মোষটা গোয়ালে আসার পরেই হঠাৎ গোয়েন্দা বরদাচরণ এসে হাজির হল কেন? বিশেষত,

গরু চুরির মামলার তদন্তে বরদাচরণের খুব নামডাক। এখানে যতগুলো গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে, তার সব কটাই বরদাচরণ নিষ্পত্তি করেছে। তা হলে—"

"তা হলে কি আপনি বলতে চান, মোষটা চুরি করে আনা হয়েছে?"

দুঃখহরণবাবু বললেন, "তাই তো মনে হচ্ছে। তবে ওর ভিতর আরও কোনও রহস্য থাকাও অসম্ভব নয়।"

রাখোবাবু গুলতিটা হাতের কাছে টেবিলের ওপর রেখে দিলেন। বদমাশ কাকটা দেওয়ালে বসে সব দিক নজর রাখছে। কখন গুলতিটার আবার দরকার হবে বলা যায় না, তারপর রাখোবাবু বরদাচরণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিসের ফোটোগ্রাফের কথা বলছিলেন যেন?"

বরদাচরণ গলাটা নিচু করে বললেন, "অত জোরে কথা বলবেন না। চারদিকে শত্রুপক্ষ কান পেতে আছে।"

রাখোবাবু অবাক হয়ে বললেন, "ফোটোগ্রাফ, শত্রুপক্ষ, এ-সব কী বলছেন বরদাবাবু?"

বরদাচরণ খুব বুদ্ধিমানের মতো একটু রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, "ওই ফোটোগ্রাফটার সন্ধানে বহু গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

রাখোবাবু বললেন, "কেন, সেই ফোটোগ্রাফে কী আছে?"

"উঁহু, অত জোরে কথা বলবেন না।" বরদাচরণ সাবধান করে দেন। চারদিকে সতর্ক চোখে চেয়ে দেখে গলা নামিয়ে বলেন, "হরিণগড়ের নাম শুনেছেন তো?"

রাখোবাবু মাথা নেড়ে বলেন, "তা আর শুনিনি। সেখানকার রাজবাড়ি দেখতে গেছি কয়েকবার।"

বরদাচরণ বললেন, "হ্যাঁ, এই ফোটোগ্রাফটার সঙ্গে সেই রাজবাড়ির একটা গভীর যোগাযোগ আছে।"

রাখোবাবু আগ্রহের সঙ্গে বললেন, "কী যোগাযোগ বলুন তো।"

বরদাচরণ আবার সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "আস্তে। সবাই শুনতে পাবে যে! ব্যাপারটা হল, হরিণগড়ের রাজা গোবিন্দনারায়ণের একমাত্র ছেলে কন্দর্পনারায়ণ খুব অল্প বয়সে হারিয়ে যায়। সন্দেহ করা হয়, কন্দর্পনারায়ণকে কোনও দুষ্ট লোক চুরি করে নিয়ে যায়। সে প্রায় দশ বছর আগেকার কথা। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কন্দর্পনারায়ণের খোঁজে হাজারটা লোক লাগানো হয়েছে, পুলিশ থেকে তো প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়েছেই। কিন্তু ছেলেটার খোঁজ পাওয়া একটু কঠিন হয়েছে, কারণ, কন্দর্পনারায়ণের যে-সব ফোটোগ্রাফ তোলা হয়েছিল সেগুলো রাজবাড়ির কয়েকটা অ্যালবামে লাগানো ছিল। কন্দর্পনারায়ণের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব অ্যালবামও উধাও। যারা কন্দর্পনারায়ণকে চুরি করেছে তারা খুবই চালাক লোক। তারা জানে, ছবি না থাকলে কন্দর্পনারায়ণের খোঁজ করা খুবই মুশকিল হবে। কেননা কন্দর্পনারায়ণকে তো আর সবাই দেখেনি। রাজবাড়িতে বা অন্য কোথাও যুবরাজ কন্দর্পনারায়ণের কোনও ছবিই নেই। ফলে যারা হারানো রাজকুমারের খোঁজ করছে তারা যাকে-তাকে রাজকুমার ভেবে ধরে-ধরে রাজবাড়িতে নিয়ে এসেছে এতকাল। এ পর্যন্ত প্রায় কয়েক হাজার ছেলেকে এইভাবে রাজবাড়িতে হাজির করা হয়েছে। তাতে খুব গণ্ডগোল হয়। যে সব ছেলেদের ধরে আনা হয়েছিল তাদের বাপ-মাও এই নিয়ে খুব হইচই করে। এদিকে রাজা গোবিন্দনারায়ণ, রানী অম্বিকা এবং রাজার মা মহারানী হেমময়ী রাজকুমারের জন্য পাগলের মতো হয়ে গেছেন। গত দশ বছর ধরে তাঁরা ভাল করে খান না বা ঘুমোন না। কিন্তু একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত।"

পুরুতমশাই খুব মনোযোগ দিয়ে পিছনে বসে শুনছিলেন। আর থাকতে না পেরে হঠাৎ বলে উঠলেন, "কী, ব্যাপার সেটা?"

হঠাৎ পিছন থেকে সতীশ ভরদাজের গলা শুনে বরদাচরণ চমকে লাফিয়ে উঠে বললেন, "কে? কে? কে আপনি?"

বলতে বলতে বরদাচরণ অভ্যাসবশে পিস্তলের জন্য কোমরে হাত দিলেন।

রাখোবাবু বললেন, "ভয় পাবেন না বরদাবাবু, উনি আমাদের পুরুতমশাই। এতক্ষণ তো এখানেই বসে ছিলেন। দেখেননি?"

বরদাচরণ অবাক হয়ে বলেন, "না তা! উনি এখানেই ছিলেন?"

সতীশ ভরদ্বাজ রেগে গিয়ে বলেন, "হ্যাঁ বাপু, আগাগোড়া এখানে বসে আছি। তোমাকে পাঁচিলে উঠতে দেখলাম, কাকের তাড়া খেয়ে গাছের ডগা ভেঙে পড়তে দেখলাম। চারদিক লক্ষ করো না, কেমন গোয়েন্দা হে তুমি?"

বরদাচরণ পিস্তলের জন্য কোমরে হাত দিয়ে খুব অবাক। পিস্তলটা নেই। স্তম্ভিত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, "এ কী! আমার পিস্তল?"

সতীশ ভরদ্বাজ ভয়ে আঁতকে উঠে বললেন, "পিস্তল খুঁজছ কেন বাপ? না, না, আমি তোমাকে অপমান করার জন্য কিছু বলিনি। তুমি বড় ভাল গোয়েন্দা।"

বরদাচরণ বিরক্ত হয়ে বলেন, "আমি যে ভাল গোয়েন্দা সে আমি জানি। কিন্তু আমার পিস্তলটা কোথায় গেল?"

সতীশ ভরদ্বাজ বললেন, "বন্দুক পিস্তল বড় ভাল জিনিস নয় বাবা। গেছে তো যাক, ও নিয়ে তুমি আর ভেবো না, ওসব কাছে রাখলেই মানুষের মনে জিঘাংসা আসে।"

রাখোবাবুর আবছা মনে পড়ল, বরদাচরণের হাতে তিনি যেন পিস্তলটা একবার দেখেছিলেন। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে বললেন, "আজ বোধহয় পিস্তলটা ভুলে এসেছেন।"

বরদাচরণ মাথা নেড়ে বলেন, "বলেন কী, পিস্তল আমার হাতের আঙুলের মতো অচ্ছেদ্য। পিস্তল ছাড়া কখনও বেরোই না। চারদিকে আমার অনেক শত্রু।"

"মানুষ মাত্রেই ভুল হয়, রাখোবাবু বলেন।

বরদাচরণ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে বলেন, "এমন বিরাট ভুল জীবনে কখনও করিনি। যাকগে, কন্দর্পনারায়ণের কথায় আসি, কী যেন বলছিলাম?"

পিছন থেকে সতীশ ভরদ্বাজ বলে উঠলেন, "তুমি বলছিলে, একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত।"

বরদাচরণ কটমট করে সতীশ ভরদ্বাজের দিকে তাকিয়ে কঠিনস্বরে বললেন, "আপনি আড়ি পেতে আমার সব কথা শুনেছেন। কিন্তু খুব সাবধান এ-সব কথা যেন পাঁচ-কান না হয়।"

সতীশ ভরদ্বাজ মাথা নেড়ে বললেন, "ঘুণাক্ষরেও না, ঘুণাক্ষরেও না। গল্পটা বড় ভাল ফেঁদেছ। বলো তো শুনি।"

"গল্প নয়।" বলে বরদাচরণ আর-একবার পুরুতমশাইয়ের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে ফের রাখোবাবুকে বললেন, "হ্যাঁ, একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত। সেটা হল, কন্দর্পনারায়ণকে চুরি করা

হলেও খুন করা হয়নি। কন্দর্পনারায়ণ যেখানেই থাক, সে বেঁচেই আছে। কারণ, সে চুরি যাওয়ার পর থেকে প্রতি বছর গোবিন্দনারায়ণের নামে একটা করে চিঠি আসে। চিঠিগুলো লেখে কন্দর্পনারায়ণ নিজেই। কিংবা ছেলে-চোরেরা তাকে দিয়ে চিঠি লেখায়। তাতে শুধু একটা কথাই লেখা থাকে—বাবা, আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি ভাল আছি। ব্যস্, আর কিছু থাকে না। সাধারণত জানুয়ারি মাসেই চিঠি আসে। আর, চিঠিগুলো আসে কখনও দিল্লি থেকে, কখনও বোম্বে থেকে, কখনও এলাহাবাদ থেকে। চিঠিগুলোতে কন্দর্পনারায়ণের হাতের ছাপ থাকে। কাজেই সন্দেহ নেই যে, সেগুলো তারই লেখা।”

বারান্দায় রেলিঙের ফাঁক দিয়ে তিনটে মুখ ঢুকিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে সরোজ, মনোজ আর পুতুল গল্প শুনছিল। কিন্তু ইস্কুলের সময় হয়ে যাওয়ায় মেজকাকা ভজহরি এসে তাদের ডেকে নিয়ে গেলেন।

বরদাচরণ বললেন, “প্রতি বছর যে-সব জায়গা থেকে চিঠি আসে সে-সব জায়গায় লোক পাঠানো হয়, পুলিশকেও জানানো হয়। কিন্তু কন্দর্পনারায়ণের চেহারা কেমন সেটা না-জানলে তাকে খুঁজে বের করা তো সম্ভব নয়। তাই এখন কন্দর্পনারায়ণের একটা ছবি খুঁজে বের করার জন্য রাজা গোবিন্দনারায়ণ আমাকে কাজে লাগিয়েছেন। রাজবাড়ির অ্যালবাম ছাড়াও কন্দর্পনারায়ণের আরও দু-একটা ছবি থাকতে পারে কোথাও। সেই আশায় গোবিন্দনারায়ণ আমার সাহায্য চেয়েছেন। তাই আমি বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে ছোট ছেলের ছবি খুঁজে বেড়াচ্ছি। যদি কারও কাছে এমন কোনও ছোট ছেলের ছবি থেকে থাকে, যাকে কেউ চিনতে পারছে না তা হলে সেই ছবি রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাজির করার হুকুম রয়েছে।”

রাখোবাবু বলে উঠলেন, “সে তো ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।” বলেই ফের মাথা নেড়ে রাখোবাবু বলেন, “না না ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় কথাটা এখানে খাটে না, এটা হল গিয়ে ডোমবনে বাঁশকানা।”

সতীশ ভরদ্বাজ বলে ওঠেন, “ডোমবনে বাঁশকানা আবার কী? বলুন, বাঁশবনে ডোমকানা।”

“ওই হল। “লজ্জা পেয়ে রাখোবাবু বলেন, “সারা তল্লাট জুড়ে বাচ্চা ছেলের ছবি খুঁজে বেড়ানো তো বিরাট ব্যাপার।”

বরদাচরণ বলেন, “ডিউটি ইজ ডিউটি। গোবিন্দনারায়ণ আমাকে এ কাজের জন্য মাসে পাঁচশো টাকা করে দিচ্ছেন। তা ছাড়া, ছবি যার কাছে পাওয়া যাবে তাকে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। অবশ্য যদি সেটা রাজকুমার কন্দর্পনারায়ণের আসল ছবি হয়।”

রাখোবাবু খুব হেসে বললেন, “হাসালেন বরদাবাবু। হরিণগড়ের রাজাদের আর্থিক অবস্থা আমি জানি। বছর দুই আগেও গিয়ে দেখে এসেছি, রাজমাতা হেমময়ী দরবার-ঘরের বাইরের দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছেন। আরও কী দেখেছি জানেন? দেখেছি, রাজা গোবিন্দনারায়ণ শশা খাচ্ছেন। আর রানী অম্বিকা বাগানের জঙ্গল থেকে কচুর শাক তুলছেন। এক হাজার টাকা পুরস্কার। হুঁঃ।”

এই বলে রাখোবাবু উঠে যাচ্ছিলেন।

বরদাচরণ বললেন, “সবটা শুনুন রাখোবাবু, তারপর না হয় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন।”

সতীশ ভরদ্বাজও বললেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবটা শোনা উচিত।”

রাখোবাবু মুখটা বিকৃত করে বললেন, “আপনি কী বলতে চান বরদাবাবু যে রাজার মা ঘুঁটে দেয়, যার রানী কচুর শাক তোলে এবং যে রাজা নিজে শশা খায় সে পাঁচশো টাকায় গোয়েন্দা ভাড়া করবে আর একটা ছবির জন্য হাজার টাকা পুরস্কার দেবে, এটা বিশ্বাসযোগ্য?”

বরদাচরণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, "শুনুন রাখোবাবু। রাজার মা যে ঘুঁটে দেন সেটা অভাবে নয়। সময় কাটানোর জন্যই তিনি ঘুঁটে দেন। রানী অম্বিকা কচুর শাক তুলছিলেন বটে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে তাঁদের অন্য তরকারি জোটে না। আসলে গোবিন্দনারায়ণের কচুর শাকের ওপর খুব রাগ। কিন্তু রানী নিজে কচুর শাক ভালবাসেন বলে চুপি-চুপি নিজেই তুলে নিয়ে গোপনে রান্না করে খান। আর শশা? হাঃ হাঃ। গোবিন্দনারায়ণের ডায়াবেটিস হওয়ার পর থেকে ডাক্তার তাঁকে কেবল শশা খেয়েই থাকতে বলেছেন যে! শশার মধ্যে চিনির ভাগ খুবই কম। আর এ তো সবাই জানে গোবিন্দনারায়ণের রাজত্ব এখন না থাকলেও রাজবাড়ির হাজারটা সুড়ঙ্গ দিয়ে মাটির তলায় যে সব চোর কুঠুরিতে যাওয়া যায় সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার হীরে জহরত আর মোহর রয়েছে! অবিশ্বাস করবেন না রাখোবাবু, আমি এরকম একটা চোর কুঠুরিতে নিজে একবার ঢুকেছিলাম।"

সতীশ ভরদ্বাজ বলে উঠলেন, "সত্যি বলছ বাবা বরদাচরণ?"

"আমি মিথ্যে বলি না," বরদাচরণ গম্ভীরভাবে বলেন।

সতীশ ভরদ্বাজ বলেন, "তা হলে একবার আমার বাড়ি যাও তো। মনে পড়ছে, আমার বাড়ির কুলুঙ্গিতে একটা ছোট্ট ন্যাংটো ছেলের হামা-দেওয়া ছবি আছে। আমার ব্রাহ্মণী আবার সেটাকে গোপালের ছবি ভেবে পুজো-টুজো করেন। একবার দেখো তো সেই-ছবিটাই নাকি!"

ঠাকুরমশাইয়ের কথায় কেউ কান দিল না।

বরদাচরণ বললেন, "রাখোবাবু, গত বছর আপনার বাড়ির সামনের বাগান থেকে সরস্বতী পুজোর আগের দিন রাত্রে অনেক ফুল ও ফল চুরি যায়, খবর পেয়ে এসে আমি তদন্ত করে বের করি যে, সে সব ফুল ও ফল চব্বিশ পল্লীর ছেলেরা তাদের পুজোর জন্য চুরি করেছিল। মনে আছে?"

রাখোবাবু রেগে গিয়ে বলেন, "তাতে মাথা কিনেছিলেন, আর কি! ধরে লাভটা কী হয়েছিল? তারা তো সে সব ফুল-ফল আমার গাছে এসে আবার লাগিয়ে দিয়ে যায়নি!"

বরদাচরণ গম্ভীরভাবেই বললেন, "এবং ওরা চুরি কেন করেছিল তাও আমি বের করেছিলাম। আপনি সেবার ওদের চাঁদা দেননি।"

রাখোবাবু রেগে গিয়ে বলেন, "কেন দেব? চব্বিশ পল্লীর পুজো আপনার পাড়ায় হয়। বেপাড়ার পুজোর চাঁদা দেব কেন? আর এও বলে রাখছি, সে চুরির পেছনে আপনার হতচ্ছাড়া ভাগনে ওই চাক্কুও ছিল।"

বরদাচরণ বললেন, "শুনুন রাখোবাবু, উত্তেজিত হবেন না। আমি সেই চুরির ব্যাপার আলোচনা করতে আসিনি।"

"তা হলে কী জন্য এসেছেন?"

"যখন আমি এ বাড়িতে সেই চুরির ব্যাপারে তদন্ত করছিলাম তখন হঠাৎ আমার খুব জলতেষ্টা পায়। আমি পুতুলের কাছে এক গ্লাস জল চাই। পুতুল তখন এই বারান্দায় বসে একটা ছবির অ্যালবাম খুলে তার এক বন্ধুর সঙ্গে বসে ফোটোগুলো দেখছিল। সে অ্যালবাম রেখে জল আনতে গেল, তখন আমি আনমনে অ্যালবামটা তুলে ছবিগুলো দেখছিলাম। তার মধ্যে একটা খুব সুন্দর চেহারার ছেলের ছবি ছিল। ছেলেটা একটা বাংলো-বাড়ির সামনের সিঁড়িতে বসে আছে, তার পাশে একটা কাচের গ্লাসে দুধ রয়েছে। দুধটা একটা বেড়াল খেয়ে নিচ্ছে...মনে পড়ছে আপনার? পুতুল জল নিয়ে এলে আমি তাকে ওই ছবিটা কার তা জিজ্ঞেস

করায় সে বলতে পারল না। আমি তখন মনোজ, সরোজ এবং ভজবাবুকেও জিজ্ঞেস করি। তারা কেউ কিছু বলতে পারেনি। কিন্তু ছেলেটা দেখতে এত সুন্দর এবং ছবিটা এত রহস্যময় যে আমি ব্যাপারটা ভুলতে পারিনি। আজ ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল। কিছু যদি মনে করেন তো আপনাদের ছবির অ্যালবামটা একটু আনুন, আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে ওই ছবিটাই কুমার কন্দর্পনারায়ণের।"

রাখোবাবু একটু হাঁ করে থেকে বলে উঠলেন, "তাই তো বরদাবাবু! তাই তো!" বলেই হঠাৎ উঠে চেঁচাতে লাগলেন—"রামু, রঘু, কিরমিরিয়া জলদি অ্যালবাম আন। জলদি।"

ডাক শুনে কিরমিরিয়া রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডুকরে কেঁদে উঠল, "ও দাদাবাবু গো, আমি কিছু জানি না গো! আমি কিছু করিনি গো!"

রঘু 'জলদি' শুনতে 'জল' শুনে এক গ্লাস জল নিয়ে পড়িমরি করে দৌড়ে এল। আর রামু তাড়াতাড়ি বাড়ির পিছনে গিয়ে লুকল।

যাই হোক, অনেক চেঁচামেচি, খোঁজাখুঁজির পর অ্যালবামটা পাওয়া গেল।

হাঁফাতে হাঁফাতে রাখোবাবু অ্যালবাম এনে পাতা খুলে ছবিটা খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে-খুঁজতে একটা পাতায় দেখা গেল ছবিটা যে-চারটে স্টিকারে লাগানো ছিল তা লাগানোই আছে, কিন্তু ছবিটা নেই।

রাখোবাবু হতাশ হয়ে বসে বললেন, "সর্বনাশ!"

বরদাচরণ অ্যালবামটা তুলে নিয়ে দেখলেন। মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেল। হঠাৎ আস্তে করে বললেন, "রাখোবাবু, এখন আমার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে এ ছবিটাই ছিল কন্দর্পনারায়ণের ছবি।"

সতীশ ভরদ্বাজ বলে ওঠেন, "আমার ঘরে যে বালগোপালের ছবিটা আছে, বুঝলে বাবা বরদা, সেটাও—"

বরদাচরণ সতীশ ভরদ্বাজকে পাত্তা না-দিয়ে বললেন, "অ্যালবাম থেকে ছবিটা চুরি যাওয়াতেই ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অ্যালবামটা আমি নিয়ে যাচ্ছি রাখোবাবু, ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো দেখতে হবে। আর বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদও করা দরকার।"

রাখোবাবু উদভ্রান্তের মতো চেঁচাতে লাগলেন, "সবাই এসো এদিকে। চলে এসো। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। কড়কড়ে হাজারটা টাকা ফসকে গেল, ইয়ার্কি পেয়েছ নাকি? কোথায় গেল সরোজ, মনোজ, পুতুল?"

রঘু ভয়ে ভয়ে বলে, "খোকাখুকিরা ইস্কুলে গেছে।"

"ডেকে আন ইস্কুল থেকে।"

হারাধন তার ল্যাবরেটরির দরজা খুলে বেরিয়ে এসে গম্ভীরভাবে বলে, "কী হয়েছে বলো তো। ওই বরদা ক্লাউনটা কোনও গোলমাল করছে নাকি?"

বরদাচরণ গম্ভীরভাবে বলেন, "ক্লাউন কে তা আয়না দিয়ে নিজের মুখ দেখলেই টের পাবে হারাধন। আমি জরুরি কাজে এসেছি, ইয়ার্কি কোরো না।"

"হুঁ! জরুরি কাজ! কার বেড়াল চুরি গেল, কার বাগান থেকে কে লাউ নিয়ে গেল, কার গরু হারাল, এ সব খুঁজে বেড়ানোই যার কাজ তার আবার ডাঁট কত!"

বরদাচরণ বলেন, "তবু ভাল, লাউয়ের সঙ্গে কুমড়ো মেশানোর চেষ্টা করে লোক হাসাইনি।"

রাখোবাবু দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, "সবাই চুপ করো। শোনো সবাই, আমি মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি বাড়ির লোককে। এর মধ্যে চুরি-যাওয়া ছবিটা খুঁজে বের করতেই হবে।"

ইস্কুলে ইন্টারক্লাস ক্রিকেট লিগ চলছে। সেই নিয়ে এবার চারদিকে খুব উত্তেজনা। এমনিতে এক ক্লাসের সঙ্গে অন্য ক্লাসের খেলায় আর উত্তেজনার কী থাকবে?

আসলে হয়েছে কি, এবার ক্লাস নাইনে দুটি নতুন ছেলে এসে ভর্তি হয়েছে। তারা যমজ ভাই, হুবহু একরকম দেখতে। তারা পোশাক করে একইরকম, টেরি কাটে মাথার একই ধারে, এমন কি দুজনেরই বাঁ গালে তিল। তফাত শুধু নামে, একজনের নাম সমীর, অন্যজনের নাম তিমির। দুই ভাই-ই দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলোয়াড়। তবে খেলাতে দুই ভাইয়ের কিছু তফাত আছে। সমীর সাঙ্ঘাতিক জোরে বল করে, তার বল চোখে ভাল করে ঠাহর হয় না। অন্যজন তিমির বেদম ব্যাট করে, প্রায় ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেও নট আউট থেকে যায়।

দুই যমজ ভাইয়ের দৌলতে ক্লাস নাইন এবার দুরন্ত টিম। স্কুলের চ্যাম্পিয়ন তো তারা হবেই জানা কথা। শোনা যাচ্ছে এবার সমীর আর তিমিরকে জেলা একাদশেও নেওয়া হবে। যেদিন ক্লাস নাইনের খেলা থাকে সেদিন মাঠের চারধারে বহু লোক জমে যায় সমীর-তিমিরের বলের হলকা আর ব্যাটের ভেলকি দেখতে।

নাম-ডাক হওয়াতে দুই ভাইয়েরই কিছু ডাঁট হয়েছে। এমনিতেই তারা বড়লোকের ছেলে। তাদের বাবা সিভিল সার্জেন। দুটো সবুজ রঙের রেসিং সাইকেলে চেপে তারা ইস্কুলে আসে। টকাটক ইংরিজিতে নিজেদের

মধ্যে কথা বলে। কাউকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না। ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা পর্যন্ত তাদের একটু সমঝে চলেন।

ওদিকে ক্লাস এইটও বেশ ভাল টিম। যদিও তাদের সমীর বা তিমিরের মতো বোলার বা ব্যাটসম্যান নেই তবু গেম টিচার তারক গুহ বলেন, "আমার মনে হয়, ক্লাস এইট একটা আপসেট করতে পারে।"

এইট-এর ক্যাপটেন মনোজ। বলতে কি, ক্লাস সেভেন-এ পড়ার সময়ে সে প্রথম ক্রিকেটের হাতে-খড়ি করে। ব্যাট খারাপ করে না, বলও খুব জোরে করতে পারে। এইট-এ উঠে ইন্টারক্লাস লিগে এ পর্যন্ত সব কটা ম্যাচ তারা জিতেছে। প্রত্যেকটাতেই মনোজের রান ভাল, উইকেটও খারাপ নেয়নি।

তারক গুহ প্রবীণ লোক। একসময়ে নাকি কলকাতায় ভাল টিমে ক্রিকেট খেলতেন। কোচ হিসেবে তাঁর তুলনা নেই, সবাই বলে। মফস্বলের স্কুলে সামান্য বেতনের গেম টিচারের চাকরি করেন বলে তেমন পাত্তা দেয় না কেউ। রোগা, কোলকুঁজো, বুড়ো শকুনের মতো চেহারা তারকবাবুর। গায়ের রঙ ব্ল্যাকবোর্ডের মতো কালো। পান খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলো সব খয়েরি হয়ে গেছে। গায়ে সব সময়ে বেঢপ বড় সাইজের সাদা ফুলহাতা জামা, পরনে সাদা জিনের প্যান্ট, কোমরে কখনও দড়ি কখনও মোটা চামড়ার বেল্ট বাঁধা, পায়ে কেডস। এ ছাড়া তারকবাবুকে অন্য পোশাকে দেখা যায় না। জামাকাপড় সব সময়ে ময়লা। নাকে নস্যি দেন বলে শোনা সর্দির গলায় কথা বলেন। তাঁর ল্যাকপ্যাকে হাত পা, চেহারা আর পোশাক দেখে কিছুতেই ভাবা যায় না যে এ নোক খেলার কিছু জানে।

তারকবাবুকে সমীর-তিমিরও পাত্তা দেয় না। বরং তারকবাবুই সেধে যেচে ওদের কাছে গিয়ে নেট প্র্যাকটিসের সময় নানারকম উপদেশ দেন। ওরা হাসে। সমীর একদিন মুখের ওপরেই বলে দিল, "আপনি তো স্যার কখনও ফাস্ট বল চোখেই দেখেননি ভাল করে, ইনসুইং-এর গ্রিপ আপনার কাছে কী শিখব! আমি কলকাতায় ফাদকারের কাছে বোলিং শিখেছি।"

সেই থেকে তারকবাবুর ওদের ওপর খুব রাগ। ভাল খেলো সে তো ঠিক আছে, তা বলে প্রশিক্ষককে সম্মান দেবে না?"

সেই থেকে তারকবাবু হন্যে হয়ে অন্য ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে সত্যিকারের ক্রিকেট প্রতিভা খুঁজে বেড়িয়েছেন।

এইভাবেই একদিন মনোজকে তাঁর নজরে পড়ে। এইট-এর সঙ্গে টেন-এর খেলা ছিল। মনোজ বারো রানের মাথায় একটা হুক মারতে গিয়ে ক্যাচ তোলে। আউট হয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে তারকবাবু ধরলেন। বললেন, "ছোকরা, তোমার বয়সী কোনও ছেলে যে লেট কাট মারতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। কোত্থেকে শিখলে?"

মনোজ আমতা-আমতা করে বলল, "ক্রিকেটের বইয়ের ছবি দেখে স্যার।"

"বাঃ! বাঃ!"।

ভারী খুশি হলেন তারকবাবু, তাঁর কোটরগত চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল। বললেন, "সত্যিকারের প্লেয়ার হতে চাও? তবে আমি তোমাকে প্লেয়ার বানাব, কিন্তু একটু কষ্ট করতে হবে বাবা।"

মনোজ রাজি হয়ে গেল।

সেই থেকে তারকবাবু গোপনে মনোজকে তালিম দেন। মাঝে মাঝে বলেন, "তোমার বডি় তো খুব ফিট। দমও অনেক। ফাস্ট বোলিং তোমার হবেই।"

সারা স্কুলে মোট পাঁচটা টিম। ফাইভ, সিক্স, সেভেন মিলিয়ে একটা টিম, আর চারটে উঁচু ক্লাশের।

ক্লাশ নাইন ক্লাশ এইট ছাড়া বাকি সবাইকে হারিয়ে দিল। ক্লাশ এইট ও নাইন ছাড়া বাকি সবাইকে হারাল; দু ক্লাশের পয়েন্ট সমান। এই দুই ক্লাশের খেলায় যে জিতবে সে-ই চ্যাম্পিয়ন।

সবাই জানে নাইন জিতবে। ইলেভেন-এর বড় ছেলেদের সঙ্গে খেলাতেও নাইন নয় উইকেটে জিতেছিল। সমীর নটা উইকেট পায় মাত্র নয় রানে। তিমির নিরানব্বই করেছিল একা। কাজেই বোঝা যাচ্ছে ক্লাস নাইন কী সাঙ্ঘাতিক টিম।

আজ ফাইনাল খেলা। ফার্স্ট পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি হয়ে গেল। খেলার মাঠের চারিদিকে দারুণ ভিড় আর ধাক্কাধাকি। মাঝের মাঝখানে তিনটে করে ছটা স্টাম্প গাড়া হয়ে গেছে। স্বয়ং সিভিল সার্জেন, ডি এস পি আর মুনসেফ খেলা দেখতে এসেছেন। তাঁদের জন্য আলাদা চেয়ারের ওপর ছোট ত্রিপল টাঙানো হয়েছে। ক্রেট বোঝাই লেমোনেড এসেছে মাঠে। চানাচুর, ঝালমুড়ি, ফুচকা আর আইসক্রিমের গাড়ি জড়ো হয়েছে। বেশ মেলা-মেলা ভাব।

তারকবাবু প্রচণ্ড উত্তেজনায় ছোটাছুটি করছেন।

এইট-এর ক্যাপটেন মনোজ আর নাইন-এর ক্যাপটেন সমীর মাঠে নেমে টস করল।

টসে জিতে গেল মনোজ। বিনা দ্বিধায় বলল, "ব্যাট।"

সমীর একটু কাঁধ ঝাঁকাল মাত্র।

ওয়ান ডাউনে মনোজ নামবে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান দুজন মাঠে রওনা হয়ে যেতেই তারক স্যার এসে বললেন, "মনোজ প্যাড-আপ করো। এক্ষুনি উইকেট পড়বে।"

মনোজ প্যাড বাঁধতে বাঁধতে বলল, "একঘণ্টা টিকতে পারলে হয়।"

তারক স্যার নিজে প্রচণ্ড উত্তেজিত। তবু বললেন, "উত্তেজিত হয়ো না মনোজ। আমি জানি সমীরের সুইং নেই। কিন্তু অসম্ভব জোরে বল আসে বলে আনাড়িরা খেলতে পারে না, লাগার ভয়ে আউট হয়ে চলে আসে। তুমি ঘাবড়াবে না।"

স্যারের কথাই ঠিক। মাঠে নামতে না নামতে ওপেনিং ব্যাট গদাইচরণ সমীরের দ্বিতীয় বলে বোলড হয়ে ফিরে এল।

মনোজ যখন নামছে তখন ক্লাশ এইট-এর ছেলেরা খুব হাততালি দিল। সমীর দূর থেকে বলটা লোফালুফি করতে করতে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। তারকবাবু মনোজের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মাঠের মধ্যে খানিকদূর এলেন, বার বার বললেন, "সোজা বল, খেলতে অসুবিধা নেই। প্রথম থেকেই একটু মেরে খেললে দেখবে ও কাবু হয়ে গেছে।"

যদিও মনোজ খুব সাহসী ছেলে তবু এখন তার হাত-পা একটু ঝিম ঝিম করছিল! হাঁটুর জোরটা যেন কমে গেছে, হাতে ব্যাটটা বেশ ভারী-ভারী লাগছে।

গার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে ফিলডারদের অবস্থান দেখতে একটু সময় নিল মনোজ। ভয় করছে। বেশ কয়েকবার বুকটা দুরদুর করে ওঠে।

সমীর ওভারের তৃতীয় বলটা দিতে প্রায় স্ক্রিনের কাছাকাছি চলে গেছে। অত দূর থেকে দৌড়ে এসে বল করলে সে বল যে কী মারাত্মক জোরের বল হবে তা ভাবতেই মনোজের পেটটা গুলিয়ে উঠল।

চারদিকের মাঠ স্তব্ধ। সমীর জেট প্লেনের মতো দৌড়ে আসছে। এসে বাঁই করে হাত ঘোরাল।

বলটা একবার দেখতেও পেল না মনোজ। একটা আবছা লাল ফিতের মতো কী যেন সড়াক করে পিচের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। বেকুবের মতো মনোজ দাঁড়িয়ে থাকে। স্লিপের ফিলডাররা হাসছে।

আবার সমীর দৌড়ে আসে। বল করে। আবার সেই লাল ফিতের মতো লম্বাটে একটা ছায়া দেখতে পায় মনোজ। কিন্তু এমন সাঙ্ঘাতিক তার গতি যে ব্যাটটা তুলবারও সময় হয় না।

মনোজের ভাগ্য ভাল যে, দুটো বলই ছিল বাইরের।

সে আবার ব্যাট আঁকড়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু হাত পা ঝিম ঝিম করে, চোখে অন্ধকার-অন্ধকার লাগে। স্ক্রিনের কাছ থেকে সমীর ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত দৌড়ে আসছে।

মনোজের একবার দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হল। অনেক কষ্টে সে ইচ্ছে দমন করে প্রাণপণে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে সমীরের বল করার কায়দাটা দেখতে লাগল।

সমীরের হাত যখন ঘোরে তখন ঠিক সিলিং ফ্যানের মতো ঘূর্ণমান চক্রের মতো দেখায়।

এবার লাল ফিতেটা বাইরে দিয়ে গেল না। সোজা চলে এল মনোজের দিকে। গুড লেংথে পড়ে মিডলস্টাম্পে।

মনোজ ব্যাট হোলেনি, হাঁকড়ায়নি, কিচ্ছু করেনি। বলটা এসে আপনা থেকেই ব্যাটটাকে একটা ঘুষি মেরে অফ-এর দিকে গড়িয়ে গেল।

একটা বল আটকেছে মনোজ, তাইতেই হাততালি পড়ল চারদিকে।

সমীর শেষ বলটা করতে আসছে। একইরকম গতিবেগ। তবে এখন মনোজের অতটা ভয় করছে না।

এ বলটাও সোজা এল। একটু শর্ট পিচ পড়ে কোমর সমান উঁচু হয়ে লেগ-এর দিকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মনোজ ব্যাটটা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ভেগে-যাওয়া বলটা জোর চাপড়ে দেয়। সেই চাপড়ানিতে বলটা আরো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে একলাফে বাউন্ডারি ডিঙিয়ে আরও পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে পড়ল। ছক্কা।

হাততালির তুমুল শব্দে কানে তালা লাগবার জোগাড়।

পরের ওভারে বল করল সরোজ। এইট-এর ওপেনিং ব্যাট ষষ্ঠীব্রত সে ওভারটা খুটখাট করে কাটিয়ে দিল। রান হল না।

পরের ওভারে আবার সমীর বল করতে আসে, মনোজ ব্যাট করবে।

চারিদিক থেকে চিৎকার ওঠে, "মনোজ আর একটা ছক্কা চাই।"

আগের ওভারে একটা ছক্কার মার খেয়ে সমীরের শরীরে আগুন লেগে গেছে। সে তিনগুণ জোরে দৌড়ে এসে যে বলখানা দিল তা অ্যাটম বোমের মতো। কিন্তু মনোজের বুকের দুরদুরুনিটা এখন নেই। হাত-পাও বেশ বশে এসে গেছে। চোখেও কিছু খারাপ দেখছে না।

অফ স্টাম্পের ওপর বলটা ছিল। মনোজ পা বাড়িয়ে ব্যাটখানা পিছনে তুলে বলটার ঠিক ব্রহ্মতালুতে ব্যাটখানা দিয়ে চাপড়াল। বলটা মাটিতে একটা ঠোকর খেয়ে স্লিপের মাঝখান দিয়ে সে কি পড়ি মরি দৌড়, যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

বাউন্ডারি। হাততালি। চিৎকার।

পরের বল মিডল স্টাম্পে, গুড লেংথ। সাধারণত ব্যাটসম্যান এ বল আটকায়। মনোজের এখন আর আটকানোর কথা মাথায় আসছে না। মার না পড়লে সমীরের ধার ভোঁতা হবে না। পিচে পড়ে বলটা ওঠার মুখে, মনোজ এগিয়ে সেটাকে অন ড্রাইভ করল। সমীরের জোরালো বল সে মার সইতে পারল না, বন্দুকের গুলির মতো মাঠের বাইরে বেরিয়ে গেল।

লাইনের ধারে লোকেরা ভীষণ চেঁচাচ্ছে, ছেলেরা লাফাচ্ছে, স্বয়ং তারকবাবু নিয়ম ভেঙে দু-দুবার মাঠের মধ্যে ছুটে এসেছিলেন, তাঁকে হেডস্যার এসে ধরে নিয়ে গেলেন।

মনোজ এখন আর অন্য কিছু দেখছেও না, শুনছেও না। তার সমস্ত মন চোখ এখন বলের দিকে। একের পর এক বল আসে আর মনোজ এগিয়ে পিছিয়ে, শরীর বাঁকিয়ে নানা কায়দায় কেবল পেটায়। তার মারমূর্তি দেখে সমীরের বল একদম ঝুল হয়ে গেল। দশ ওভারের পর হাঁফাতে হাঁফাতে তার জিভ বেরিয়ে গেছে, মনোজ তখন আশি ছাড়িয়ে গেছে। টোটাল বিরানব্বই। এর মধ্যে শুধু ষষ্ঠীব্রত আউট হয়েছে। আর কোনও ঘটনা ঘটেনি।

মফস্বলের স্কুলের খেলায় লাঞ্চ বা টি হয় না। একনাগাড়ে খেলা চলে। এক ইনিংসের খেলা একদিনেই শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় ইনিংস বলে কিছু নেই।

কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছিল, ক্লাশ এইট-এর ব্যাটের দাপট আজকে কমবে না। এক ইনিংসও আজ শেষ হবে না।

মনোজ সমীরকে তিন-তিনটে চার মেরে নব্বইয়ের কোঠায় ঢুকে গেল। স্কোরাররা তাল রাখতে পারছে না রানের গতির সঙ্গে।

ওদিকে দর্শকদের মধ্যে একজন কালো চশমা পরা গম্ভীর মানুষ এসে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গলায় দূরবীন, কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে। কোমরে পিস্তরের খাপ আছে বটে কিন্তু তাতে পিস্তল নেই। বরদাচরণ মনোজ আর সরোজকে জেরা করতে এসেছেন।

কিন্তু খেলা ভাঙার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না বলে তিনি খুবই বিরক্ত, বার বার ঘড়ি দেখছেন। একবার ধৈর্য হারিয়ে বলেই ফেললেন, "দূর ছাই, ছেলেটা কি আউট হবে না নাকি?"

পাশেই তারকবাবু ঘাসের ওপর বসে জুলজুলে চোখে মনোজের খেলা দেখছেন! বরদাচরণের কথা শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, "কী! কী বললেন মশাই?"

ল্যাকপ্যাকে রোগা হলেও তারকবাবুকে তখন হুবহু খুনির মতো দেখাচ্ছিল।

তারকবাবু খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "ইয়ার্কি পেয়েছেন মশাই? ক্রিকেটের মতো সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ইয়ার্কি? কোন আক্কেলে আপনি ওই অলক্ষুণে কথা বললেন?"

চেঁচামেচিতে মুহূর্তের মধ্যে বরদাচরণের চারধারে ভিড় জমে গেল। স্বয়ং ডি এস পি এগিয়ে এসে বললেন, "আরে! এ যে দেখছি সেই কমিক্যাল গোয়েন্দা ভদ্রলোক! কী করেছেন উনি?"

তারকবাবু আগুন হয়ে বললেন, "ইনি চাইছেন মনোজ আউট হয়ে যাক।" বরদাচরণের কাঁদো কাঁদো অবস্থা। লোকজন চারদিক থেকে আওয়াজ দিচ্ছে। একজন সিটি দিল, অন্যজন বলে উঠল, "ওরে দ্যাখ

গোয়েন্দাচরণের পিস্তলের খাপ ফাঁকা!” আর একজন এসে বরদাচরণের দূরবীনটা তুলে দূরের জিনিস দেখতে লাগল। সানগ্লাসটা খুলে নিল একজন।

চাক্কু মামার দুরবস্থা দেখছিল দূর থেকে। সে আরও একটা জিনিস লক্ষ করে রেখেছে। সে লক্ষ করেছে ক্রিকেট মাঠের বাইরে ঘাসজমিতে মনোজদের কুখ্যাত দুষ্টু গরু হারিকেন চরে বেড়াচ্ছে।

চাক্কু কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে হারিকেনের দিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে মনোজের নিরানব্বই। সমীর সরে গেছে অনেক আগে। একটা আনাড়ি ছেলে বল করতে আসছে। একটা রান অনায়াসে হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে চারদিক থেকে তুমুল চিৎকার উঠল। বোলার ছেলেটা তার দৌড়ের মাঝপথে হঠাৎ বাঁ দিকে ঘুরে প্রাণপণে মাঠের বাইরে ছুট লাগাল। আম্পায়ার অঙ্ক স্যার একটা স্টাম্প উপড়ে বাগিয়ে ধরে তারপর কী ভেবে স্টাম্পটা হাতে করেই দৌড়তে থাকেন।

হতভম্ব মনোজ প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারেনি। তারপরই দেখতে পেল, তাদের গরু হারিকেন বাঁ ধারে লাইনের পাশে প্রায় আট-দশজনকে গুঁতিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে, তারপর মাঠে ঢুকে দুজন ফিল্ডারকে ধরাশায়ী করে এখন পিচের দিকে ছুটে আসছে। তার মুখে ফেনা, চোখ লাল, ফোঁস ফোঁস শ্বাস ছেড়ে বাঘের গলায় ‘হাম্বা ডাক ছাড়ছে।

তার সেই মূর্তি দেখে মুহূর্তে মাঠ ফাঁকা। ডি এস পি, সিভিল সার্জেন, হেডস্যার কে কোথায় গেলেন কে জানে! চারদিকে জড়ামড়ি করে কিছু ছেলে আর লোক পড়ে গেছে মাঠে। হারিকেন মনোজকে চেনে, কাজেই সে মনোজের দিকে দৃকপাত করে সোজা মাঠের লাইনের ধারে দর্শকদের দিকে ছুটে গেল।

বরদাচরণ পিস্তলের খাপে হাত বাড়িয়ে বড় হতাশ হলেন। তাই তো! হারিকেন আর কাউকে না ধরে কী করে যেন বরদাচরণকেই টারগেট বানিয়ে তেড়ে গেল।

অসমসাহসী বরদাচরণ পালানোর চেষ্টা করেও পারলেন না। দেওয়াল থেকে পড়ে হাঁটুতে চোট। সুতরাং তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। হারিকেন তেড়ে এসে ঢুঁ মারতেই বরদাচরণ বাঁ পাশে সরে গেলেন। আবার ঢুঁ। বরদা আবার ডানপাশে সরলেন।

দারুণ জমে গেল খেলা। বরদাচরণ ভারসাস হারিকেন। ক্রিকেটের কথা ভুলে লোকজন বুলফাইট দেখতে আবার ভিড় জমিয়ে ফেলল।

ভিড়ের ভিতর থেকে একটা লোক তার গায়ের লাল র‍্যাপারটা খুলে বরদাচরণের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, “বরদাবাবু, আমাদের আসল বুল ফাইট দেখিয়ে দিন।”

হারিকেনের তৃতীয় ঢুঁটা এড়াতে গিয়ে বরদাচরণ মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। হারিকেন আবার ফিরে আসছে। বরদাচরণ করেন কী? তাড়াতাড়ি লাল ব্যাপারটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বুল ফাইটারের মতোই হারিকেনকে দেখিয়ে সেটা নাড়তে লাগলেন। হারিকেন দৌড়ে এল। বরদাচরণ খুব দক্ষতার সঙ্গে সরে গেলেন। কিন্তু হারিকেন বোকা ষাঁড় নয়, সে হল ত্যাঁদড়া গরু। বরদাচরণের ওপর তার রাগ কেন তা অবশ্য বোঝা গেল না। কিন্তু লাল র‍্যাপার নিয়ে বরদাচরণকে ইয়ার্কি করতে দেখে, তার রাগ চড়ে গেল কয়েক ডিগ্রি। চারদিকে লোকজন ‘শাবাশ! বাহবা! হুররে! লেগে যা, ঘুরে ফিরে।’ বলে চেঁচাচ্ছে। তাই শুনে আরও খেপে

গেল হারিকেন। কিন্তু এবার আর সে তাড়াহুড়ো করল না। খুব ভাল করে বরদাচরণকে লক্ষ করে দেখে নিল। তারপর হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগিয়ে এসে আচমকা ধেয়ে এসে তার চার নম্বর ঢুঁ লাগাল।

সেই ঢুঁতে হাতি পর্যন্ত টলে যায় তো মানুষ কোন ছার! বরদাচরণ সেই গুঁতো এড়াতে পারলেন না, তিন হাত শূন্যে ছিটকে উঠে চার হাত দূরে গিয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগলেন, "পুলিশ, দমকল, বাবারে!"

হারিকেন অবশ্য আর বরদাচরণের দিকে দৃকপাত করল না। সে চমৎকার লাল আলোয়ানটা দেখে মুগ্ধ হয়ে খুব হাসি-হাসি মুখ করে সেটা মুখে নিয়ে চিবোতে লাগল। যার আলোয়ান, সে ডুকরে উঠে বলতে লাগল, "গেল বার ষাট টাকায় কিনেছিলাম গো! গরুর পেটে আস্ত ষাটটা টাকা ওই চলে গেল!

কারও সাহস হল না হারিকেনের মুখ থেকে আলোয়ানটা কেড়ে আনবে।

অসম সাহসী গোয়েন্দা বরদাচরণ অনেকটা পথ হামাগুড়ি দিয়ে হেটে গিয়ে ইস্কুলের বারান্দায় উঠে বসে কোঁকাতে লাগলেন। আজকের দিনটা তাঁর ভাল যাচ্ছে না। একটা ভুতুড়ে কাকের তাড়া খেয়ে দেওয়াল থেকে পড়েছেন। পিস্তল হারিয়েছেন। ত্যাঁদড় গরুর পাল্লায় পড়ে একেবারে বেহাল হয়েছেন। কিন্তু গুরুতর আহত হয়েও তিনি তাঁর কর্তব্যকর্ম বিস্মৃত হননি। সামান্য একটু দম নিয়েই তিনি হামাগুড়ি দিয়ে চারদিকে ঘুরে সরোজ আর মনোজকে খুঁজতে লাগলেন। তার দৃঢ় ধারণা, কুমার কন্দর্পনারায়ণের দুর্লভ ছবিটার হদিশ ওদের কাছে পাওয়া যাবে।

কিন্তু সরোজ আর মনোজ তখন ইস্কুলের ত্রিসীমানায় নেই। তাদের গরু হারিকেন আজকের ম্যাচ খেলা নষ্ট করেছে, একজনের আস্ত লাল আলোয়ান চিবিয়ে খেয়েছে, বরদাচরণের ক-খানা হাড় ভেঙেছে তা কে জানে! হারিকেন ছাড়া পেলে শহরে তুলকালাম সব কাণ্ড হয়। আর লোকে এসে তাদের গালমন্দ করে, ক্ষতিপূরণ চায়, কয়েকবার পুলিশের কাছেও নালিশ হয়েছে। তাই আজ হারিকেনের কাণ্ড দেখে দুই ভাই কোন ফাঁকে সটকে পড়েছে।

এদিকে বরদাচরণকে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে আবার লোকে ভিড় করে এল। হেড স্যার, ডি এস পি, সিভিল সার্জেন, ছাত্র আর মাস্টারমশাইরা তাঁকে ঘিরে ধরে বোঝাতে লাগলেন, আপনি আহত হয়েছেন বরদাবাবু, এবার একটু বিশ্রাম নিন। ফার্স্ট এইড দেওয়া হবে।

বরদাচরণ বললেন, "ডিউটি ইজ ডিউটি। আমি সরোজ আর মনোজকে এক্ষুনি জেরা করতে চাই। খুব জরুরি দরকার।"

ছেলেরা খবর দিল, ওদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হারিকেন ওদেরই গরু কিনা। তাই ওরা লজ্জায় চলে গেছে।

ইতিমধ্যে ডি এস পি থানায় খবর পাঠিয়েছেন, যেন সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এসে বদমাশ গরুটাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। আলোয়ানওয়ালা লোকটা এসে ক্ষতিপূরণের জন্য ঘ্যানর ঘ্যানর করছে। সমীর আর তিমির বলে বেড়াচ্ছে, হেরে যাওয়ার ভয়ে ক্লাশ এইট গরুটাকে মাঠের মধ্যে তাড়া করে এনেছিল। তাই শুনে তারকবাবু খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "ওই গরুটার জন্যই তোমরা এ যাত্রা বেঁচে গেলে। ক্রিকেট খেলার অ-আ-ক-খ-ই এখনও তোমাদের রপ্ত হয়নি।"

ইস্কুলে যখন এইসব কাণ্ড চলছে তখন মনোজদের বাড়ির অবস্থা খুব থমথমে। রাখোবাবু সবাইকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছেন, তার মধ্যে হারানো ছবিটা খুঁজে বের করতেই হবে। রাখোবাবু এই কথা ঘোষণা করেই

হাতঘড়িটা হাতে পরে নিয়ে মাঝেমাঝে সময় দেখছেন আর বলছেন, "এই তিন ঘণ্টা হয়ে গেল...এই চার ঘণ্টা দশ মিনিট...প্রায় পাঁচ ঘণ্টা...আর মাত্র উনিশ ঘণ্টা আছে কিন্তু।"

বাড়িসুদ্ধ লোক ঘরদোর তোলপাড় করে ছবি খুঁজতে লেগেছে। সতীশ ভরদ্বাজ দুপুরবেলা বাড়ি যাওয়ার সময় বলে গেছেন, "আমার হাঁদু-ভুঁদু থাকলে একলহমায় ছবি-কে-ছবি এমনকি কন্দর্পনারায়ণকেও খুঁজে বের করে কাঁধে বয়ে এনে ফেলত। কিন্তু কী করব, তারা দু মাসের ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। নইলে কোনও হাঙ্গামা ছিল না।"

হাঁদু-ভুঁদু হল সতীশ ভরদ্বাজের পোষা ভূত। সবাই তাদের কথা জানে। কেউ অবশ্য তাদের কখনও দেখেনি, কিন্তু সবাই ভয় খায় তাদের।

বৈজ্ঞানিক হারাধন আকাশ থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের একটা নতুন গবেষণায় খুব ব্যস্ত। তামার তার দিয়ে গোটা কুড়ি ঢাউস গ্যাস-বেলুন আধ মাইল উঁচুতে তুলে দেওয়া হবে। সেখানে কোনও একটা স্তরে প্রচুর বিদ্যুতের একটা বলয় রয়েছে। তামার তার বেয়ে সেই বিদ্যুৎ ধরে এনে নানা কাজে লাগানো যাবে বলে হারাধন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। কিন্তু আধ মাইল লম্বা কুড়িটা তামার তার জোগাড় করা চাট্টিখানি কথা নয়। তার ওপর তারগুলো এমন জট পাকিয়ে যায় যে, জট ছাড়াতে গলদঘর্ম।

হারাধন বিরক্ত হয়ে উঠোনে পায়চারি করছিল। সতীশ ভরদ্বাজের কথা শুনে বলল, "হাঁদু- ভুঁদুর ছুটি ক্যানসেল করে একটা টেলিগ্রাম করে দিন না ঠাকুরমশাই।"

সতীশ ভরদ্বাজ হারাধনকে দেখতে পারেন না। দু পাতা বিজ্ঞান পড়ে এরা ঘোর নাস্তিক হয়ে গেছে। কিছু মানে না। ভরদ্বাজ ঠাকুরমশাই রেগে গিয়ে বললেন, "টেলিগ্রাম করব, ইয়ার্কি পেয়েছ নাকি? তাদের দেশ তো আর শহর গঞ্জে নয় যে, টেলিগ্রাম যাবে। তারা থাকে প্রেতলোকের গহীন রাজ্যে। সেখানে আলো নেই, অন্ধকার নেই, কেবল ঘোর সন্ধেবেলার মতো আবছা এক জায়গা। চারদিকে ছমছম করছে অদ্ভুত গাছপালা, পাহাড় হ্রদ। মড়ার মাথা চারদিকে ছড়ানো, হ্রদে জলের বদলে রক্ত, পাহাড় হচ্ছে হাড়গোড় দিয়ে তৈরি। বাদুড়, শকুন আর পেঁচা ছাড়া কোনও পাখি নেই। সেখানকার গাছে ফুল ফুটলে পচা নর্দমার গন্ধ ছাড়ে। সেখানে আকাশের রঙ ঘোর কালো, চাঁদ তারা সূর্য কিচ্ছু নেই। সেখানকার রাজার প্রাসাদ তৈরি হয়েছে মাথার খুলি দিয়ে। গায়ে গায়ে পিশাচ, শাঁকচুন্নি, মামদো, ব্রহ্মদৈত্য, খোক্কস সব সেখানে বসবাস করে। আমি কতবার গিয়েছি।"

হারাধন হেসে ফেলে বলে, "জায়গাটা বেশ ভাল মনে হচ্ছে ঠাকুরমশাই। একবার আমাকে নিয়ে চলুন না।"

সতীশ ভরদ্বাজ সে-কথার জবাব দেননি। শুধু বলেছেন, "আসুক হাঁদু-ভুদু, বিশ্বাস না হয় তাদের মুখেই শুনে নিয়ো।"

এই বলে ঠাকুরমশাই চলে গেলেন।

বিকেলের দিকে গরু দোয়াতে গিয়ে রামু মহাবিপদে পড়ল। চোখে ভাল ঠাহর হয় না তার, কিন্তু তা বলে একেবারে কানাও তো সে নয়। হাতিয়ে-টাতিয়ে, নিরীখ-পরখ করে সব জিনিসেরই একটা আন্দাজ পায়। আজ যেন সে গোয়ালে ঢুকে হারিকেনের গায়ে হাত দিয়েই বুঝতে পারল, গরুটা আর আগের মতো নেই। দিব্যি বড়সড় হয়ে উঠেছে, গায়ে খোঁচা-খোঁচা লোম, আর ভারী ঠাণ্ডা স্বভাব, দুধ দোয়ানোর সময় রোজ যেমন

দাপাদাপি করে, বালতি উল্টে ফেলে দেয় বা পায়ের চাঁট ছোড়ে, আজ তেমন কিছু করল না। দুধও দিল এক কাঁড়ি। বালতি ভরে প্রায় উপচে পড়ে আর কী! খুব আনন্দ হল রামুর। কিন্তু বালতি-ভরা দুধ নিয়ে সে যখন হাসি-হাসি মুখ করে গোয়াল থেকে বেরোতে যাচ্ছে তখন দোরগোড়ায় একটা মুশকো মতো লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেল।

"কৌন হ্যায় রে?" বলে রামু চোখ পাকিয়ে তাকায়।

মুশকো লোকটা দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে। এমন ব্যাদড়া লোক যে, রামুর পথও ছাড়ছে না।

ভয় পেয়ে রামু চেঁচাল, "কৌন চোট্টা হ্যায় রে! এখনও সন্ঝা হয়নি, এরই মধ্যে গরু চোরাতে এসেছিস?"

এই বলে রামু বালতিটা রেখে হঠাৎ দুহাতে লোকটাকে জাপটে ধরে চেঁচাতে থাকে, "এ মিশিরজি, এ রঘু, জলদি আও। গরু চোর ধরেছি।"

মুশকো লোকটা পেল্লায় জোয়ান। এক ঝটকায় রামুর হাত ছাড়িয়ে উল্টে তার ঘাড়টা চেপে ধরে বলল, "চোর আমি না তুই? আমার ভঁইসটাকে সারা দু পহর ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি, আর তুই চোট্টা আমার দুধেল ভঁইস ধরে এনে গোহালে বেঁধে রেখেছিস!"

রামু তখন বুঝতে পারল, এ লোকটা হল হরশঙ্কর গয়লা। এ-তল্লাটে হরশঙ্কর হচ্ছে সবচেয়ে বড় পালোয়ান। বজরঙ্গবলী মন্দিরের সামনের আখড়ায় একটা কুস্তির দঙ্গল আছে। সেখানে ফি বছর কুস্তির প্রতিযোগিতায় হরশঙ্কর অন্য সব জোয়ানদের ধরে ধরে ধোবিপাট প্যাঁচ মেরে আছাড় দেয়। ধোপা কাপড় কাচবার সময় যেমন করে আছাড় মারে, তাই হল ধোবিপাট, হরশঙ্করকে সবাই খুব সমঝে চলে।

রামুর চেঁচানি শুনে মিশির আর রঘু দুই লাঠি নিয়ে ধেয়ে এসেছিল, কিন্তু হরশঙ্করকে দেখে লাঠি ফেলে দিয়ে হাতজোড় করে 'রাম রাম' বলে খুব খাতির দেখাতে লাগল।

হরশঙ্কর কাউকে গ্রাহ্য করল না, রামুকে কাঁধে ফেলে আর মোষটাকে খোঁটা থেকে দড়িসুদ্ধ খুলে এক হাতে দড়ি ধরে রওনা দিল। যাওয়ার সময় বলে গেল, "রামু চোট্টাকে আজ পুলিশে দেব।"

রামু হরশঙ্করের কাঁধে ঝুলতে ঝুলতে কেঁদে-কেঁদে বলতে লাগল, "এ রঘু, এ মিশিরজি, আমার যদি ফাঁসি হয় তো আমার মুলুকমে একটা খত লিখে দিয়ো, পুলিশলোগ কি আমাকে পেটাবে নাকি রে বাপ? আমি কখুনো মারধোর খাইনি, কীরকম লাগবে কে জানে? ও হরশঙ্করভাই, অত জোরসে হাঁটছ কেন, আমার যে ঝাঁকুনি লাগছে!"

হরশঙ্কর কী করত বলা মুশকিল। কিন্তু গোয়াল থেকে বেরিয়ে যেই সে পাছদুয়ার দিয়ে বারমুখো রওনা দিয়েছিল—

সন্ধে হলেই ভজবাবু টর্চ নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ান। বাড়িটা বেশ বড়ই বলতে হবে। উঠোনের চারদিক ঘিরে অনেকগুলো ঘর। তা ছাড়া বাইরের দিকে বাগানের দুধারে পড়া, গান শেখা এবং বৈঠকখানার জন্য আলাদা-আলাদা ঘর আছে। এত বড় বাড়ির আনাচ-কানাচও তো কিছু কম নেই। সন্ধের অন্ধকারে কোন চোর ছ্যাঁচোড় বাড়ি ঢুকে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে কে জানে! তারপর মাঝরাতে সবাই ঘুমোলে মালপত্র নিয়ে ভাগারাম দেবে। সেই ভয়ে ভজবাবু সন্ধে হলেই টর্চ হাতে সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখেন কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা, ছাদ, সিঁড়ি, খাটের তলা, পাটাতন সব জায়গা।

আজও ভজবাবু ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পিছনের দিকে একটা বাজে জিনিস রাখবার কুঠুরির সামনে এসেই শুনতে পেলেন ঘরটার ভিতরে খুটুর-মুটুর শব্দ হচ্ছে।

ভজবাবু খুব সাহসী লোক নন। শব্দ শুনেই ভড়কে গিয়ে কাঁপাগলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ভিতরে কে-এ-এ?"

কোনও জবাব নেই। খুটুর-মুটুর শব্দ হতেই লাগল।

ভজবাবুর ঘরের ভিতরে ঢুকতে তেমন সাহস হল না। যদি চোর হয়ে থাকে তো বেশ সাহসী চোরই হবে। ভজবাবুর সাড়া পেয়েও ঘাবড়ায়নি। এসব চোর বড় সাংঘাতিক হয়।

ভজবাবু ভিতর-বাড়িতে চলে এলেন। দেখেন কিরমিরিয়া উঠোনে চাল ছড়াচ্ছে, আর সেই ভুতুড়ে কাকটা মহানন্দে নেচে নেচে চাল খাচ্ছে।

ভজবাবু বললেন, "কিরমিরিয়া, একটু সঙ্গে আয় তো চোর-কুঠুরিতে একটা চোর ঢুকে বসে আছে বলে মনে হচ্ছে।"

শুনেই কিরমিরিয়ার হাত থেকে চালের বাটিটা পড়ে গেল ঠুং করে। সে পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল, "ও বাবাগো, বাড়িতে চোর ঢুকল গো! এখন চোরকে কে ধরবে গো! চোর যে আমাদের মেরে ফেলবে গো!"

"চোপরও!" ভজবাবু এক পেল্লায় ধমক দিলেন।

সেই ধমকে কিরমিরিয়ার দাঁতকপাটি লাগবার জোগাড়। সে উঠোনে উবু হয়ে বসে মুখ বন্ধ করে গোঁগোঁ শব্দ করতে থাকে।

ভজবাবু রেগে গিয়ে বললেন, "যা, আজই তোকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলাম।"

সেই শুনে কিরমিরিয়া চোখ মুছতে-মুছতে উঠল। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "আজ আমাকে চোর মারবে গো। মেরে ফেললে আর কী করে বেঁচে থাকব গো! ও ভজবাবু গো, আমি মরে গেলে কে তোমাদের বাসন মাজবে, কাপড় কাচবে, ঘর মুছবে, ঘুঁটে দেবে গো!"

কিরমিরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আর একটা দা হাতে করে ভজবাবু চোরকুঠুরির সামনে এসে বন্ধ দরজায় কান পেতে শুনলেন, ভিতরে এখনও সেই শব্দ।

ভজবাবু বাইরে থেকে হুঙ্কার ছাড়লেন, "কে আছিস ভেতরে? শোন ব্যাটা, ভাল চাস তো এক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে চলে যা। তা হলে কিছু বলব না। আর যদি বেশি ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করিস তো রক্ষে নেই কিন্তু।"

কিরমিরিয়া কেঁদে উঠে বলল, "ও চোর-দাদাবাবু গো, ভজদাদাবাবুকে আর আমাকে মেরো না গো। ভালয় ভালয় চলে যাও গো।"

কিন্তু কুঠুরির ভিতরে চোরের তেমন গা নেই। শব্দটা হতেই লাগল।

ভজবাবু আর কী করেন! যদি চোর তাড়া করে, তবে দৌড়তে হবে বলে কাছাটা এঁটে নিয়ে এক হাতে টর্চ অন্য হাতে দা'টা বাগিয়ে ধরে দড়াম করে দরজাটা খুলে ফেলেই তিন হাত পিছিয়ে সরে দাঁড়ালেন। না, তাতেও চোরটা বেরলো না। ভজবাবু শাসালেন, "বেরিয়ে আয় বলছি। বেরোলি?"

কোনও জবাব নেই।

ভজবাবু তখন পা টিপে-টিপে ঘরের চৌকাঠে গিয়ে ভিতরে টর্চের আলো ফেলেই বললেন, "দূর! এ যে দেখছি বেড়ালটা। যাঃ যাঃ।"

খুব সাহসের সঙ্গে ভজবাবু ভিতরে ঢুকলেন। বেড়ালটা তাড়া খেয়ে পালাল। ভজবাবু চারদিকে টর্চ ফেলে ফেলে দেখলেন, হতচ্ছাড়া বেড়াল ঘরটাকে যাচ্ছেতাই রকমের বেগোছ করেছে। একধারে পুতুলের পুতুল খেলার বাক্সটাক্স সব হাঁটকে মাটকে একশেষ। ভজবাবু নিচু হয়ে পুতুলের বাক্সটা গুছিয়ে রাখতে যাচ্ছিলেন। তারপরই হঠাৎ 'বাবা গো' বলে চেঁচালেন।

সেই চিৎকারে বাইরে কিরমিরিয়া আরও জোরে চেঁচাল।

ভজবাবু স্তম্ভিতমুখে একটা পিস্তল হাতে করে নিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, "কিরমিরিয়া, চুপ কর। ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস। এ-সব চোর-টোরের কাণ্ড নয়। কোনও ডাকাত বাড়িতে ঢুকেছে। এই দ্যাখ ডাকাতের পিস্তল। অস্ত্রটা এই ঘরে লুকিয়ে রেখে ডাকাতটা নিশ্চয়ই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। লোকজন সব ডাক এক্ষুনি।"

"বাবা গো, ডাকাত গো," বলতে বলতে কিরমিরিয়া দৌড়াল। ভজবাবু টর্চ আর পিস্তল হাতে পাছ-দুয়ারের দিকে তফাতে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঘন ঘন গায়ত্রীমন্ত্র জপ করছেন আর চারদিকে নজর রাখছেন।

ঠিক এই সময়ে কাঁধে রামু আর হাতে মোষের দড়ি ধরে হরশঙ্কর গোয়ালা গোয়াল-ঘর থেকে বেরিয়ে পাছ-দুয়ারের দিকে আসছিল। রামু দু হাত জড় করে ঝুলতে-ঝুলতে বলছে, "জয় বাবা রামজি, আমার তো কাল ফাঁসি হয়ে যাবে।"

দৃশ্যটা দেখে ভজবাবু হাঁ। আজকাল চোর ডাকাতের যে কী পরিমাণ সাহস বেড়েছে। এই ভর সন্ধেবেলা গেরস্তর ঘুরে ঢুকে গরু মানুষ সব ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ডাকাতটার চেহারা যেমন পেল্লায়, তেমনি হাবভাবও রাজা জমিদারের মতো। দৌড়ে পালাবি, তা নয়, কেমন গদাই লস্করের মতো চলছে দেখ।

ডাকাতটার এই সাহস দেখে ভজবাবু খুব রেগে গেলেন। বেয়াদপির একটা শেষ থাকা দরকার। তিনি একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুখে টর্চ ফেলে পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে বললেন, "তুই কে রে পাজি? ভর

সন্ধেবেলা মানুষ গরু চুরি করছিস, তোর আক্কেলটা কীরকম? চুরি করবার এই নাকি সময় তোদের? চক্ষুলজ্জা বলে জিনিস নেই?”

হরশঙ্কর মস্ত বড় পালোয়ান বটে, কিন্তু পিস্তল দেখে তার রক্ত জল হয়ে গেল। সে রামুকে ধমাস করে মাটিতে ফেলে দিল, মোষের দড়িও ছেড়ে দিল। দু হাত জোড় করে বলল, “গোড় লাগি ভজবাবু, এই রামু বদমাশটা আমার ভঁইসটাকে চুরি করেছিল, তাই ভাবলাম, যাই গিয়ে ভঁইসটাকে নিয়ে আসি।”

ভজবাবু উত্তেজনায় হরশঙ্করকে প্রথমে চিনতে পারেননি, এখন চিনতে পেরে পিস্তলটা আরও ভালভাবে বাগিয়ে ধরে বললেন, “ও, তুই সেই পাজি হরশঙ্কর, না? দুধে জল মেশাস!”

হরশঙ্কর কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, “আর কখনও মিশাব না। হুজুর, মাফি মাঙে।

হুম! ভজবাবু একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, “সবই তো বুঝলাম। কিন্তু পিস্তলটা এল কোত্থেকে! আর ডাকাতটাই বা গেল কোথায়?

পিস্তলের গুণ দেখে ভজবাবু অবাক। এত বড় পালোয়ান হরশঙ্কর গোয়ালা পিস্তলের সামনে কেমন নেতিয়ে পড়ল। হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে বলল, “বড়বাবু, জান বাঁচিয়ে দিন। কান পাকড়াচ্ছি, আর দুধে জল দিব না। আপনাদের কোঠিতেও কখনও ঘুষব না।”

ভজবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, “ঠিক আছে, মোষ নিয়ে চলে যা। আর যদি কখনও...”

“রাম, রাম। আউর কখনো হোবে না।” বলে হরশঙ্কর তার মোষ নিয়ে চলে গেল।

ভজবাবু পিস্তলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখে অদ্ভুত একটা হাসি। সত্যিই পিস্তলের মতো জিনিস হয় না। এই পিস্তল নিয়ে বাজারে গেলে দোকানিরা একঝটকায় দাম কমিয়ে প্রায় জিরোতে নামিয়ে ফেলবে। পিস্তলটাকে এক হাতে ধরে অন্য হাতে সেটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে ভজবাবু আপনমনে বললেন, “তাই তো বলি, একটা পিস্তল ছিল না বলেই এতকাল কেউ আমাকে গ্রাহ্য করছিল না।”

ভাবতে ভাবতে ভজবাবুর রক্ত গরম হয়ে গেল। তাঁর মনে হতে লাগল, এই পিস্তলের জোরে তিনি যা খুশি করতে পারেন। যত বড় বদমাশ বা গুণ্ডা হোক সবাই পিস্তলের সামনে হরশঙ্করের মতোই ভেজানো ন্যাতা হয়ে নেতিয়ে পড়বে।

ভজবাবুর খুব ইচ্ছে হল, পিস্তলের শক্তিটা একটু ভাল করে পরখ করেন। তাই কাউকে কিছু না বলে র‍্যাপারের তলায় পিস্তলটা লুকিয়ে নিয়ে ভজবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এবার সবাইকে তিনি বুঝিয়ে দেবেন কত ধানে কত চাল।

কিরমিরিয়ার চেঁচামেচি শুনে বাড়ির লোকজন দৌড়ে এসেছিল। কিন্তু তারা এসে ভজবাবুকে খুঁজে পেল না।

হরিণগড়ের রাজা গোবিন্দনারায়ণ সন্ধেবেলা আহ্নিক সেরে জলযোগ করছেন। মস্ত বড় এক শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর রুপপার থালায় ডাঁই করে কাটা শশা দেওয়া হয়েছে। গোবিন্দনারায়ণ সোনার চামচ দিয়ে শশা মুখে তুলে কচমচ করে চিবোচ্ছেন। মুখে একটা তৃপ্তির ভাব।

টেবিলের অন্য ধারে গোবিন্দনারায়ণের ভাগনে কৌস্তভনারায়ণ বসে মামার শশা খাওয়া দেখছে। গোবিন্দনারায়ণের মতো শশাখোর লোক কৌস্তভ আর দেখেনি। একটা মানুষ একা যে কত শশা খেতে পারে,

তা হরিণগড়ে এসে রাজা গোবিন্দনারায়ণকে না দেখলে বোঝা যায় না।

কৌস্তভ অবশ্য মামার শশা খাওয়া দেখতেই যে এসে বসে থাকে তা নয়। তার অন্য মতলব আছে। মামার নিরুদ্দেশ ছেলে কন্দর্পনারায়ণ যদি আর ফিরে না আসে, তবে মামার বিষয়সম্পত্তি সব সেই পাবে। সেই আশায় কৌস্তভ প্রায়ই আনাগোনা করে। চারদিকে ঘুরঘুর করে মামার বিষয়সম্পত্তি কত তা বুঝবার চেষ্টা করে।

পঁয়তাল্লিশটা শশার টুকরো খাওয়ার পর গোবিন্দনারায়ণ একটা পেল্লায় ঢেকুর তুলে একটু দম নেওয়ার জন্য চামচটা রাখলেন। পেটের মধ্যে জায়গা করার জন্য উঠে একটু পায়চারি করতে লাগলেন।

কৌস্তভ সুযোগ বুঝে খুব সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল, "মামাবাবু, কন্দর্পর কোনও খবর পেলেন?"

গোবিন্দনারায়ণ তাঁর ভাগনেটিকে বিশেষ পছন্দ করেন না। ভাগনে কৌস্তভ বলে নয়, আসলে তিনি কোনও আত্মীয়স্বজনকেই ভাল চোখে দেখেন না। তার কারণ, আত্মীয়স্বজন এলেই তাদের সঙ্গে নানারকম লৌকিকতা করতে হয়। ভাল-মন্দ খাওয়াও রে, ধারকর্জ দাও রে, গরিব বলে সাহায্য করো রে, পালা-পার্বণে জামাকাপড় দাও রে।

রাজা গোবিন্দনারায়ণ বড় কৃপণ মানুষ। তিনি নিজে কখনও প্রাণে ধরে ভাল-মন্দ খান না, কাউকে খাওয়াতে ভালবাসেন না। রাজা হয়েও তিনি ছেড়া জামাকাপড় সেলাই করে পরেন। বাবুগিরি তিনি দু চক্ষে দেখতে পারেন না। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শখ হল অবসর সময়ে আপনমনে টাকা গোনা। রাজবাড়ির গুপ্ত কুঠুরিতে লোহার সিন্দুক থেকে টাকা বের করে ঘন্টার পর ঘন্টা গোনেন। শোনা যায়, এক টাকার নোটে আর খুচরো পয়সায় দশ বিশ হাজার টাকা কয়েক ঘন্টায় গুনে ফেলতে পারেন। কিন্তু সে সব টাকা কেবল গোনার জন্যই।

ভাগনে কৌস্তভের দোষ হল সে সবসময়ে এক পেট খিদে নিয়ে মামাবাড়িতে আসে। এসেই মামি বা দিদিমার কাছে গিয়ে বলে, "ওঃ, যা একখানা খিদে পেয়েছে না, দশটা চাষার ভাত একাই খেতে পারি এখন।"

তা পারেও কৌস্তভ। চেহারাটা রোগা-রোগা হলেও খেতে বসলে তাজ্জব কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে। একবার আশিটা কৈ মাছ খেয়েছিল, অন্যবার বাহাত্তরটা রাজভোগ। সেসব ভাবলে কৌস্তভকে দেখে গোবিন্দনারায়ণের খুশি হওয়ার কথা নয়।

প্রশ্ন শুনে গোবিন্দনারায়ণ বললেন, "না। অন্ধকার হয়ে এল কস্তু, বাড়ি যাবি না?"

কৌস্তভ ঘড়ি দেখে বলল, "রাত আর কই হল! শীতের বেলা বলে আলো চলে গেছে। এই তো পৌনে ছটা মাত্র। তা মামাবাবু, কন্দর্পকে খোঁজার জন্য আপনি নাকি গোয়েন্দা লাগিয়েছেন?"

"সে আমি লাগাইনি। গুচ্ছের টাকার শ্রাদ্ধ। গোয়েন্দা লাগিয়েছে তোর মামি। মর্কট গোয়েন্দাটা নাকি পাঁচশো টাকা করে নেবে ফি মাসে। শুনে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। আমি স্রেফ বলে দিয়েছি, আগে খুঁজে বের করো, তারপর টাকাপয়সার কথা হবে। কস্তু, আজ বড় ঠাণ্ডা পড়বে রে, এই বেলা না হয় দুর্গা-দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়।"

কৌস্তভ বিরক্ত হয়ে বলে, "বেরোতে বললেই কি বেরোনো যায়! আজ মামিকে বলেছি গাওয়া ঘিয়ের লুচি খাব। মামি রাজি হয়েছে।"

গোবিন্দনারায়ণ আঁতকে উঠে বললেন, "ও বাবা রে!"

কৌস্তভ তাড়াতাড়ি উঠে বলল, "কী হল মামাবাবু, কিছু কামড়াল নাকি?"

"না বাবা, কামড়ায়নি। গাওয়া ঘি কত করে দর যাচ্ছে বল তো!"

"ওঃ। কত আর হবে! বেশি নয়।"

"তোদের আর কী! যার যাচ্ছে তার যাচ্ছে। তা যা, বরং তোর মামির কাছেই গিয়ে বোস গে।"

এই বলে গোবিন্দনারায়ণ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার শশার থালার সামনে বসলেন। কৌস্তভ বিরক্ত হয়ে উঠে গেল। কিন্তু রাজা গোবিন্দনারায়ণের আর শশা খেতে ইচ্ছে করল না। 'গাওয়া ঘিয়ের লুচি' বাক্যটা তার মনের মধ্যে মশার মতো পন্-ন্ পন্-ন্ করে উড়তে থাকে, আর মাঝে-মাঝে কুটুস করে কামড়ায়। বড্ড অস্বস্তি।

মন খারাপ হলে গোবিন্দনারায়ণ সোজা মাটির নীচের চোর-কুঠুরিতে গিয়ে সিন্দুক খুলে টাকা গুনতে বসে যান। মন যদি অল্প খারাপ হয় তবে হাজার পাঁচ-সাত নোট গুনলেই আস্তে আস্তে মনটা ভাল হয়ে ওঠে। বেশি মন খারাপ হলে কখনও দশ বিশ ত্রিশ হাজারও গুনতে হয়। আজকে 'গাওয়া ঘিয়ের লুচি' কথাটা ভুলবার জন্য কত হাজার গুনতে হবে তা গোবিন্দনারায়ণ বুঝতে পারছিলেন না।

মনে হচ্ছে, আজ পঞ্চাশ-ষাট হাজার নোট গুনতে হবে। সেই সঙ্গে ফাউ হিসেবে হাজার দুই টাকার খুচরো পয়সাও গুনলে কেমন হয়? পঞ্চাশ হাজার নোটে 'গাওয়া ঘি' কথাটা ভুলতে পারলেও 'লুচি' কথাটা মন থেকে তুলতে ওই দু হাজার টাকার খুচরো দরকার হতে পারে।

সে যাই হোক, রাজা গোবিন্দনারায়ণ চাবির থোলো হাতে অন্দরমহলের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। তারপর মেহগিনির পালঙ্কের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে মেঝের একটা জায়গা থেকে চৌকো একটা কাঠের পাটাতন সরালেন। গর্ত নেমে গেছে। সরু সিঁড়ি। একটা টর্চ নিয়ে গোবিন্দনারায়ণ সিঁড়ি বেয়ে সুড়ঙ্গপথে নামতে লাগলেন। হাত দশেক নামলে একটা সরু গলি। গলির গায়ে দুধারে মোট চারটে ঘর। বড় বড় মজবুত তালা ঝুলছে ঘরগুলোর লোহার দরজায়। প্রথম বাঁ হাতি ঘরটার তালা খুলে গোবিন্দনারায়ণ ঢুকে পড়ে আলো জ্বাললেন।

ছোট্ট ঘরটায় গোটা চারেক সিন্দুক রয়েছে। একটাতে একশো টাকার নোট, অন্যগুলোয় কোনওটাতে পাঁচ কোনওটাতে এক আর কোনওটায় কেবল খুচরো পয়সা।

রাজা গোবিন্দনারায়ণ আজ সব কটা সিন্দুকই খুলে ফেললেন। বাণ্ডিল বাণ্ডিল নোট হাসতে লাগল।

লোকে কাশ্মীর যায়, দার্জিলিং যায়, কন্যাকুমারিকায় গিয়ে বেড়ায়। কোথাও সূর্যোদয় দেখে, কোথাও সমুদ্র বা পাহাড় দেখে মুগ্ধ হয়, বা তীর্থে গিয়ে পুণ্য করে আসে। তেমনি এই চোর-কুঠুরিতে এলে গোবিন্দনারায়ণেরও কাশ্মীর, কুলুভ্যালি, দার্জিলিং বা কন্যাকুমারিকা দেখা হয়ে যায়। চোর-কুঠুরির মতো এমন সুন্দর জায়গা দুনিয়ায় দ্বিতীয়টা নেই।

গোবিন্দনারায়ণ তাড়াহুড়ো করলেন না। মেঝেয় একটা কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে বসে ধীরেসুস্থে সব সিন্দুক থেকেই বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা নামিয়ে মেঝেতে সাজালেন। গাওয়া ঘি থেকে শুরু করে লুচি পর্যন্ত পুরো বাক্যটা মন থেকে তুলে ফেলতে কত টাকা লাগবে তা আগেভাগে বলা মুশকিল।

দীর্ঘ দিন ধরে বার বার গোনবার ফলে নোটগুলো ভারী নেতিয়ে পড়েছে। ময়লাও হয়েছে বড় কম নয়। তা ছাড়া অনেক নোট এত পাতলা হয়ে গেছে যে একটু নাড়াচাড়া করলেই ছিঁড়ে যাবে। খুচরো পয়সাগুলোও

আঙুলের ঘষা খেয়ে তেলতেলে হয়ে পড়েছে। এখন আর তাদের গায়ে লেখা অক্ষর ভাল করে বোঝাই যায় না।

গোবিন্দনারায়ণ খুব সাবধানে একটা বাণ্ডিল খুলে খুব আলতো আঙুলে টাকা গুনতে শুরু করলেন—এক...দুই...তিন...চার...

গুনতে গুনতে পাঁচশো ছশো পেরিয়ে হাজার ধরো-ধরো হয়ে গেল। গোবিন্দনারায়ণ চোর-কুঠুরির বন্ধ বাতাসে ঘেমে উঠছেন। একটু শ্বাসকষ্টও হচ্ছে। তবু বুঝতে পারছেন তার মন থেকে 'গাওয়া' কথাটা প্রায় লোপাট হয়ে গেছে। এত তাড়াতাড়ি ফল পেয়ে তিনি আরও তাড়াতাড়ি টাকা গুনতে লাগলেন। বাহ্যজ্ঞান প্রায় নেই।

ঠিক এক হাজার তিনশো ছাপ্পান্নটা নোটের সময়ে একটা গলার স্বর খুব কাছ থেকে বলে উঠল, "ইস! টাকাগুলো যে একদম অচল!"

রাজা গোবিন্দনারায়ণ বীরপুরুষের বংশধর। তাঁর ঊর্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষ মহারাজ দর্পনারায়ণ ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছেন। তাঁর ছেলে সম্পদনারায়ণ মস্ত শিকারি ছিলেন। গোবিন্দনারায়ণের দাদু চন্দ্রনারায়ণ ঠ্যাঙাড়েদের ঠেঙিয়ে বিলেত থেকে কী একটা খেতাব পান। আর বাবা হংসনারায়ণ তেমন কিছু না করলেও একবার একটা চোরকে জাপটে ধরে ফেলেছিলেন বলে কথিত আছে। এই সব বীরের রক্ত গায়ে না থাকলে চোর-কুঠুরিতে দ্বিতীয় মানুষের স্বর শুনে গোবিন্দনারায়ণ ঠিক মূর্ছা যেতেন। গেলেন না। তবে হঠাৎ ডুকরে উঠে বললেন, "ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে! কে কোথায় আছিস! এসে আমাকে ধরে তোল।"

ভয়ে গোবিন্দনারায়ণ ঘাড় ঘোরাতে পারছেন না। না, আসলে তিনি তেমন ভয় পাননি, ঘাড়টাই ভয় পেয়ে শক্ত হয়ে গেছে। চোখদুটোও ভয় পেয়ে ঢাকনা ফেলে বসে আছে, খুলতে চাইছে না। আর হাত পাগুলো বেয়াদপের মতো থরথর করে কাঁপছে।

গলার স্বরটা একটু কাছে এগিয়ে এসে বলল, "মহারাজ, ভয় পেলেন নাকি? ভয়ের কিছু নেই। আমি গোয়েন্দা বরদাচরণ।"

মুহূর্তে ঘাড় ঢিলে হয়ে গেল, চোখের পাতা খুলে গেল, আর গোবিন্দনারায়ণের বীরের রক্ত টগবগ করে উঠল। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, "তুমি এখানে এলে মেন করে, হ্যাঁ?"

বরদাচরণ খুবই তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, "এ আর কী দেখলেন? একবার একটা আঙুলের ছাপ খুঁজতে আলিপুরের টাঁকশালে ঢুকে গিয়েছিলাম সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। গোয়েন্দাদের সব বিদ্যে থাকা চাই।"

স্তম্ভিত গোবিন্দনারায়ণ বরদাচরণের দিকে চেয়ে বললেন, "শোনো বাপু, এই চোর-কুঠুরিতে তুমি ঢুকেছ, তার মানে তুমি রাস্তা জানো। এরপর যদি আমার এখান থেকে একটা টাকাও হারায়, তবে তোমাকে পুলিশে দেব। মনে থাকে যেন।"

"সে আর বলতে!" বলে বরদাচরণ একটু অমায়িক হেসে বললেন, "কিন্তু আপনার অত সতর্কতার প্রয়োজন কী মহারাজ? ও টাকাগুলো তো সবই মান্ধাতার আমলের। ওর তো কোনও দামই নেই।"

গোবিন্দনারায়ণ একটা শশার ঢেকুর তুলে বললেন, "বলো কি? চলবে না মানে? টাকা চলে না, এ কখনও হয়?"

বরদাচরণ গম্ভীর হয়ে বললেন, "ও-সব মান্ধাতার আমলের টাকা কবে তামাদি হয়ে গেছে। মহারাজ, আপনি কি কোনও খবর রাখেন না? সময় থাকতে যদি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিতেন তা হলে সুদও পেতেন, টাকাটাও নষ্ট হত না।"

গোবিন্দনারায়ণ হাঁ করে খানিকক্ষণ চোর-কুঠুরির দেওয়ালের দিকে চেয়ে থেকে কী যেন ভাবলেন। হঠাৎ মনে হল, তাই তো! এতকাল ধরে টাকা গুনে আসছেন গোনার নেশায়, কিন্তু কখনও তো মনে পড়েনি যে, দিন কাল পালটে গেছে, টাকাও পালটেছে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এতক্ষণ ধরে টাকা গুনে যে জিনিসটা ভুলে গিয়েছিলেন সেই জিনিসটা মাথার মধ্যে ফিরে এল। গাওয়া ঘিয়ের লুচি। গোবিন্দনারায়ণ নিজের মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে ডুকরে উঠলেন—গাওয়া ঘিয়ের লুচি! গাওয়া ঘিয়ের লুচি!

বরদাচরণ কিছু বুঝতে পারলেন না। কিন্তু ভাবলেন, টাকার শোকে রাজামশাই নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন। আর একথা কে না জানে যে, পাগলরা অনেক সময় লোককে ধরে কামড়ায়। এই ভেবে বরদাচরণ দুই লাফে চোর-কুঠুরির চৌকাঠের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সন্ধেবেলা মনোজ চুপিসারে রামায়ণ বইটা খুলে ছবিটা বের করল। ভারী চমৎকার ছবি। যখনই মনোজ ছবিটার দিকে তাকায় তখনই মনে হয় ছবির ছেলেটা যেন এক্ষুনি বলে উঠবে—বন্ধু, কেমন আছ?

ছবিটা আজ মনোজ অনেকক্ষণ দেখল। এই কুমার কন্দর্পনারায়ণ? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। মনোজ শুনেছে, রাজা গোবিন্দনারায়ণ অসম্ভব কিপটে লোক। রাজবাড়ির বুড়ো দারোয়ানের সঙ্গে ইস্কুলের বেয়ারা সুখলালের খাতির আছে। দুজনের বাড়ি এক গাঁয়ে। বুড়ো দারোয়ান নাকি সুখলালকে একবার বলেছিল, রাজা ভীষণ কৃপণ বলে রানী অম্বিকা নিজেই তাঁর এক ভাইয়ের কাছে কুমার কন্দর্পকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাপের কাছে থাকলে নাকি কন্দর্প মানুষ হত না। কন্দর্পর মামা মস্ত বড় চাকরি করে, নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। সেই মামার আবার ছেলেপুলে নেই। কন্দর্প সেই মামার কাছে মহাসুখে আছে। কিন্তু মনোজের কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, কৃপণ গোবিন্দনারায়ণের এত সুন্দর একটা ছেলে থাকতে পারে। ছবিটা যারই হোক মনোজ এই ছবিটা কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারবে না। তার যত ছেলে-বন্ধু আছে তাদের চেয়েও এই ছবির বন্ধুটা তার বেশি প্রিয়।

মনোজ রামায়ণ বইটা অন্য সব বইয়ের পিছনে সাবধানে লুকিয়ে রেখে দিল।

তাদের বাড়ির অবস্থাটা এই ভর সন্ধেবেলা খুবই থমথমে। রাখোবাবু ঘড়ি হাতে দিয়ে উঠোনে পায়চারি করতে করতে ঘন-ঘন টাইম দেখছেন আর মাঝে মাঝে হাঁক ছেড়ে সবাইকে সময় জানাচ্ছেন। বাড়ির লোকেরা সবাই ছবি খুঁজে খুঁজে হয়রান। এখন আর কেউ রাখোবাবুর হাঁকডাকে গ্রাহ্য করছে না।

মনোজের ছোট ভাইবোন দুটো কিরমিরিয়ার কাছে বসে গল্প শুনছে। গণেশ ঘোষালের কাছে বসে গলা সাধছে পুতুল। ঠাকুমা আর ঠাকুরঝি ঠাকুরঘরে বসে জপের মালা টপকাচ্ছে। মা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বাবাকে উদ্দেশ করে বলছে, "ওই একজনের চেঁচামেচিতে বাড়ি অতিষ্ঠ হয়ে গেল। হাতে ঘড়ি বেঁধে ঘড়িবাবু হয়ে চৌকিদারের মতো চেঁচাচ্ছেন তখন থেকে।" ইত্যাদি। রঘু আর রামু হ্যারিকেন হাতে হারিকেনকে খুঁজতে বেরিয়েছে। ভজবাবুকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। পাড়ার থিয়েটারে ভজবাবুই মধ্যমণি, তাঁর খোঁজে ছেলেরা বার বার আসছে। কিন্তু ভজবাবু ফিরছেন না। সবাই কিছু চিন্তিত।

কিন্তু ভজবাবুর এখন আর ফেরার উপায় নেই। র‍্যাপারের তলায় পিস্তল নিয়ে সেই যে বেরিয়েছিলেন, তারপর সাঙ্ঘাতিক-সাঙ্ঘাতিক সব কাণ্ড হয়ে গেছে শহরে।

উত্তর দিকের শহরতলিটা একটু নির্জন, গা-ছমছম করা জায়গা। এদিকে অনেক গাছ-গাছালি, মাঠঘাট আর ডোবা আছে। ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতদের আস্তানা ছিল এক সময়। এখনও গুণ্ডা-বদমাস-ডাকাতরা এই অঞ্চলটাতেই রাজত্ব করে। শহরের ভদ্রলোকেরা সন্ধের পর বড় একটা এদিকে আসে না।

কানাই মাছওলার বাড়িও এই উত্তর দিকের শহরতলিতেই, বড় রাস্তা থেকে একটা হাঁটা পথ ঘন বাঁশঝাপের ভিতর দিয়ে নেমে গেছে। সেই রাস্তার দুধারে কচুবন, ভাঁটবন আর বেঁটে কুলগাছের ঝোপে ভরা। খানিক এগোলে একটা মান্ধাতার আমলের ভাঙা কালীমন্দির চোখে পড়বে। দ্বাদশ শিবের মন্দিরও আছে বটে, তবে তার বেশির ভাগই তক্ষক, চামচিকে আর সাপখোপের বাসা, গোটা চারেক মন্দির ভেঙে স্তূপ হয়ে আছে। তবে কালীমন্দিরের কালী খুব জাগ্রত। লোকে বলে ডাকাতে-কালীবাড়ি।

কথাটা মিথ্যে নয়। কানাই মাছওলা আর তার জনা বিশেক সাঙাৎ রোজ সন্ধেবেলা মন্দিরের চাতালে বসে গাঁজা কিংবা কারণবারি খেয়ে নেশা করে। শুঁটকোমতো এক পুরুতমশাই সন্ধেবেলা এসে ধূপধুনো দিয়ে আরতি করেন ভয়ে-ভয়ে, আর বাইরে কানাই আর সাঙাৎরা 'জয় মা জয় মা' বলে বিকট সুরে হাল্লা-চিল্লা করে।

কানাই বৈকালী বাজারে গিয়ে মাছ বেচতে বসবার আগে কালী-প্রণাম সেরে যায়। লোকে বলে, কানাই রাত-দুপুরে ডাকাতি করতে বেরোয়। তা কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। তবে কিনা, কানাইকে এখনও কেউ হাতে-নাতে ধরে ফেলতে পারেনি।

আজকের আরতি খুব জমে উঠেছে। রোগা পুরুতমশাই নেচে-নেচে আরতি করে ঘেমে উঠেছেন। কিন্তু বাইরে ষণ্ডারা প্রচণ্ড হুমকি দিয়ে বলছে, "ঘুরে ফিরে। আবার হোক। চালিয়ে যাও।"

পুরুতমশাই আর করেন কী! ওরা থামতে না বললে তো আর থামতে পারেন না। বেয়াদপি করলে খাঁড়ার কোপে গলা নামিয়ে দেয় যদি! এদের খপ্পরে পড়ে যাওয়ার পর থেকে পুরুতমশাইয়ের জীবনে আর শান্তি নেই। শহরের উত্তর দিকটা নিরিবিলি দেখে কী কুক্ষণে এদিকে একখানা কুঁড়েঘর তুলে থাকতে এলেন। তারপর একদিন মাঝরাতে ডাকাতরা তাঁর গলায় সড়কি ধরল এসে, বলল, "ভাল চাও তো আমাদের কালীর পুজো করবে চলো।"

সেই থেকে আজ পাঁচ বছর একটানা কালীপুজো করতে হচ্ছে। পয়সা কড়ি পান না যে, তা নয়। ডাকাতরা মতলব হলে দেয় থোয় ভালই। কিন্তু তার বদলে অনেক নাচন-কোঁদন দেখাতে হয়। ঝাড়া ঘণ্টা দুই আরতি না-করলে ডাকাতদের মন ওঠে না। পায়ে বাত হোক, জ্বর জ্বারি, আমাশা, বায়ু, পিত্ত, কফ—কিছু মানে না ব্যাটারা। কেবল বলে—ঘুরে ফিরে। জোরসে চালাও। আবার হোক।

পুরুতমশাইয়ের জীবনটাই অন্ধকার হয়ে গেছে। তার ওপর ডাকাতদের সংস্পর্শ দোষে কবে যে পুলিশ ধরে নিয়ে হাজতবাস করায়। নানা দুশ্চিন্তায় পুরুতমশাই আজকাল খেতে পারেন না, ঘুমোতে পারেন না। দিন-দিন রোগা হয়ে যাচ্ছেন। মনে-মনে কেবল মা কালীর কাছে মানত করেন—জোড়া পাঁঠা দেব মা, এদের হাত থেকে উদ্ধার করো।

আজকের পুজোর আয়োজনটা খুব জাঁকালো রকমের। যেদিন এরকম পুজো হয়, সেদিনই পুরুতঠাকুর বুঝতে পারেন যে, আজ কোথাও কোনও গেরস্তর কপাল পুড়েছে। সাধারণত ডাকাতি করার রাতেই বড় করে

পুজো দেওয়া হয়।

একজোড়া পাঁঠা আজ বলি হয়েছে। বলির পর পাঁঠার রক্ত আঁজলা করে নিয়ে ডাকাতরা কপালে আর গায়ে মেখেছে মহা উল্লাসে। মুড়ো দুটি মায়ের ভোগে উৎসর্গ করে এখন একটা মুশকো-মতো লোক পাঁঠা দুটোকে একটা আম গাছের ডালে ঠ্যাং বেঁধে ছাল ছাড়িয়ে নাড়িভুড়ি বের করছে পেট থেকে।

মন্দিরের চাতালে বসে কানাই একটার-পর-একটা হেঁসো বালি দিয়ে ঘষে ধার তুলছে। তার চোখ দুটো টকটকে লাল। পানের রসে ঠোঁট দুটোও রক্ত-শোষার মতো দেখাচ্ছিল।

অন্য সব ডাকাতরা মদ-গাঁজা খেয়ে পেল্লায় হাঁকডাক ছাড়ছে।

এইসব দেখে পুরুতমশাইয়ের ঠ্যাং দুটো থরথর করে কাঁপে। বুকে ধড়াস-ধড়াস শব্দ। গলা শুকিয়ে কাঠ।

এই ডাকাতের দলে একটা ছেলে আছে যে একটু অন্য রকমের। তাকে দেখতে ডাকাতের মতো নয় মোটেই। ভারী সুন্দর ফুটফুটে চেহারা তার। লম্বা হলেও খুব কেটা জোয়ান নয় সে। মুখখানা মিষ্টি, চোখ দুটো ঢুলুঢুলু। গায়ের রঙ এক সময়ে টকটকে ফর্সা ছিল, কিন্তু এখন অযত্নে রঙটা জ্বলে গেছে। দেখে মনে হয়, এ বোধহয় ভদ্র ঘরের ছেলে।

কিন্তু পুরুতমশাই শুনেছেন, ডাকাত দলের বুড়ো সর্দারকে হটিয়ে একদিন নাকি একেই নতুন সর্দার বানানো হবে। ছেলেটা মদ গাঁজা খায় না, চেঁচামেচিও করে না। বেশির ভাগ সময়ে চুপচাপ বসে থাকে। তবে ছোকরা নাকি ভারী এলেমদার। বন্দুক পিস্তলের হাত খুব পরিষ্কার, বর্শার টিপ একেবারে অব্যর্থ, তা ছাড়া দুর্জয় তার সাহস।

পুরুতমশাই ঘণ্টা নেড়ে আরতি করতে-করতেই শুনতে পেলেন, একজন ডাকাত বলছে, "ওরে, আজ রাজবাড়ি লুট হবে, তোরা বেশি মদ গাঁজা খাসনি। খেলে মাথা ঠিক রাখতে পারবি না।"

শুনে পুরুতমশাইয়ের হাত থেকে ঘণ্টাটা টঙাস করে পড়ে গেল।

ওদিকে একটা বাঁশঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ডাকাতদের দৃশ্যটা লক্ষ করছিলেন আর-একজনও। তাঁর গায়ে র‍্যাপার, পরনে ধুতি। দেখলে খুব নিরীহ মানুষ বলে মনে হয়। আসলে মানুষটা নিরীহই। কিন্তু আজ তাঁর ডান হাতে একটা পিস্তল। আর চোখ দুটোও অসম্ভব জ্বলজ্বল করছে।

এ লোকটা আর কেউ নয়, স্বয়ং ভজহরি বাজাড়ু।

ভজবাবুকে যাঁরা রোজ বাজারে হাটে দেখেন, তাঁরা এই ভজবাবুকে দেখলে কিন্তু চিনতেই পারবেন না। তার মানে এ নয় যে, বেঁটেখাটো ভজবাবু হঠাৎ ছ ফুট লম্বা হয়ে গেছেন, কিংবা তাঁর থলথলে চেহারাটা হঠাৎ মাসকুলার হয়ে গেছে। সে সব না হলেও, ভজবাবুর চেহারায় এখন এমন একটা বেপরোয়া ভাব, এমন হিংস্র আর কঠিন মুখচোখ যে, লোকে দেখলেই তিন হাত পিছিয়ে পালানোর পথ খুঁজবে।

আজ বিকেলে পিস্তলটা হাতে পাওয়ার পর থেকেই ভজবাবুর এই পরিবর্তন। আপনমনে মাঝে মাঝে হাসছেন আর বিড়বিড় করে বলছেন, "এতদিন পিস্তল ছিল না বলেই কেউ আমাকে পাত্তা দিত না তেমন! আজ সব ব্যাটাকে টিট করে ছাড়ব। আজ আর কারও রক্ষে নেই।"

ভজবাবু ছেলেবেলায় যে ইস্কুলে পড়তেন তার হেড স্যার ছিলেন গোলোকবিহারী চক্রবর্তী। অমন কড়া ধাতের মানুষ হয় না। এক-একখানা থাবড়া খেলে মনে হত, বুঝি গাছ থেকে পিঠে তাল পড়ল। তাঁর ভয়ে ছেলেরা ছবি হয়ে থাকত, কারও শ্বাস পর্যন্ত জোরে বইত না। ভজবাবুর ছেলেবেলাটা এই হেড স্যারের শাসনে

কেটেছে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, ইস্কুল ছাড়বার পরেও ভজবাবু গোলোকবিহারীর ভয় আজও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। গোলোকবিহারীর বয়স এখন অষ্টাশি, কিন্তু পেল্লায় সটান চেহারা তাঁর। চোখে ঈগল পাখির মতো দৃষ্টি, গলায় বাঘের আওয়াজ, হাতির মতো মাটি কাঁপিয়ে রাস্তায় হাঁটেন, দেখা হলেই পিলে চমকে দিয়ে গাঁক করে বলেন, "এই যে ভজু, বল তো সাইকোলজি বানান কী?"

বলতে না পারলে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেন, "তোকে গাধা বললে গাধাদের অপমান করা হয়।"

গোলোকবাবুর এই অসহ্য মাস্টারি ভজবাবু বহুকাল সহ্য করেছেন। এই বুড়ো বয়সেও ভজবাবুকে রাস্তায়-ঘাটে বাজারে সর্বত্র ওই গোলোকবাবু এইভাবে অপমান করে বেড়ান। তাই পারতপক্ষে গোলোকবাবুর মুখখামুখি পড়ে যেতে চান না ভজবাবু।

আজ পিস্তল হাতে পেয়েই প্রথম তাঁর গোলোকবাবুর কথা মনে পড়ল। ওই লোকটাকে টিট করতে না পারলে জীবনে শান্তি, সুখ, স্বাস্থ্য কিছু নেই।

র‍্যাপারের মধ্যে পিস্তল লুকিয়ে নিয়ে ভজবাবু তাই সোজা আজ বিকেলে গিয়েছিলেন গোলোকবাবুর কদমতলার বাড়িতে।

গোলোক স্যার তাঁর বাইরের ঘরে বিশাল চৌকির ওপর কম্বলমুড়ি দিয়ে বসা। সামনে খোলা একখানা পাঁচসেরী এনসাইক্লোপিডিয়া। বিনা চশমায় খুদে-খুদে অক্ষর দিব্যি পড়ে যাচ্ছেন এই অষ্টাশি বছর বয়সেও।

ভজবাবু দরজার চৌকাঠে দাঁড়াতেই তিনি মুখ তুলে দেখে বললেন, "ভজু নাকি রে?"

সেই কণ্ঠস্বরে হাতে পিস্তল থাকা সত্ত্বেও ভজবাবুর বুকটা কেঁপে গেল। বললেন, "আজ্ঞে।"

অভ্যাসবশে কম্বলের ভিতর থেকে হেড স্যার একজোড়া পা বার করে দিয়ে বললেন, "পেন্নাম তাড়াতাড়ি সেরে নে, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি।"

শহর ভরে গোলোকবাবুর ছাত্র। বুড়ো ধুড়ো, ছেলে, ছোকরা মিলে বিশাল ছাত্রের ব্যাটেলিয়ান। সারাদিন তাদের সঙ্গে গোলোকবাবুর দেখা হচ্ছে আর টপাটপ প্রণাম পাচ্ছেন। প্রণাম পাওয়ার এই অভ্যাসবশেই পা বের করে ফেলেছেন তিনি।

কিন্তু আজ প্রণাম করতে আসেননি ভজবাবু। তাঁর উদ্দেশ্য গোলোকবাবুর যেখানে-সেখানে মাস্টারি করার অভ্যাসটাকে বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু র‍্যাপারের তলায় পিস্তলটা হাতের চেটোয় ঘেমে উঠল ভয়ে। গোলোকবাবু তাকিয়ে আছেন চোখে-চোখে।

ডান হাত থেকে পিস্তলটা বাঁ হাতে চালান করে প্রণামটা সেরে নেবেন বলে ভেবেছিলেন ভজবাবু। কিন্তু একটা মুশকিল হল র‍্যাপারের তলায় হাত-চালাচালি করতে গিয়ে দেখেন মাঝখানে র‍্যাপারের একটা পল্লা এসে যাচ্ছে। পিস্তলটা হাত বদল করা যাচ্ছে না। অথচ প্রণামে দেরি করাও চলে না। গোলোকবাবুর পায়ে ঠাণ্ডা লাগছে।

অগত্যা ভজবাবু ডান হাতেই পিস্তলটা ধরে রেখে বাঁ হাতে গোলোকবাবুর পায়ের ধুলো নিলেন।

গোলোকবাবু একগাল হেসে বললেন, "আমি বরাবর লোককে বলি ভজু গর্দভটার ডান বাঁ জ্ঞান নেই, তা এখন দেখছি বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সব কটা ফোরকাস্ট তোর জীবনে মিলে যাচ্ছে। বলি, তুই সব্যসাচী হলি কবে থেকে যে, বাঁ হাতে পায়ের ধুলো নিচ্ছিস?"

ভজুবাবু মাথা চুলকে বললেন, "ডান হাতে ব্যথা স্যার।"

"ব্যথা? কেন, ঢিল ছুড়তে গিয়েছিলি নাকি?"

"আজ্ঞে না।"

"বল দেখি, সব্যসাচী মানে কী?"

"যার দুই হাত সমানে চলে। টপ করে বলে দিলেন ভজবাবু। আর বলে তাঁর খুব আনন্দ হল। গোলোকবাবুর বিদখুটে সব প্রশ্নের মধ্যে খুব অল্পেরই ঠিক জবাব দিতে পেরেছেন তিনি।

"বটে?" গোলোকবাবু খুব মিষ্টি করে হেসে বললেন, "এবার তা হলে বল, সব্যসাচীর ইংরাজিটা কী হবে?"

ভজবাবুর একগালে মাছি। হাতের পিস্তলটার কথা আর মনেও পড়ল না। ভয়ে পেটের ভিতরে গোঁতলান দিচ্ছে।

"স্টুপিড।" বলে গর্জন করে উঠলেন গোলোকবাবু। ধপাস করে বইটা বন্ধ করে বললেন, "বুড়ো হতে চললি, এখনও এই সব রপ্ত হল না? গোলোক মাস্টারের ছাত্র বলে সমাজে কী করে পরিচয় দিস তোরা, অ্যাঁ? কত জুয়েল ছেলে এই হাত দিয়ে বেরিয়েছে জানিস? ওঠবোস কর। কর ওঠবোস।"

ভজবাবুর হাঁ আরও দু ইঞ্চি বেড়ে আলজিভ দেখা যেতে লাগল। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। গোলোক স্যার তাকে ওঠবোস করতে বলছেন। অ্যাঁ!

"ওঠবোস করব স্যার?" অতিকষ্টে জিজ্ঞেস করেন ভজবাবু।

"তা নয় তো কি ডন-বৈঠক করতে বলেছি। দশবার ওঠবোস করে তারপর ছুটি পাবি। শুরু করে দে।"

"হাঁটুতে বাত যে স্যার।"

"বাত সেরে যাবে।"

"হাড়ে মটমট শব্দ হয়।"

"হোক শব্দ, তাতে তোর শব্দরূপ ধাতস্থ হবে।"

"আমার যে পঞ্চান্ন বছর প্রায় বয়স হল স্যার।"

"শিক্ষার আবার বয়স কী রে উল্লুক? কর ওঠবোস। বাঁ হাতে পেন্নাম করা তোমার বের করছি। কর ওঠবোস!" গোলোকবাবু একটা হুঙ্কার ছাড়লেন।

সেই হুঙ্কারে ভজবাবু কুঁকড়ে যেন ক্লাশ সিক্স-এর ভজু হয়ে গেলেন। তারপর বাতব্যাধি ভুলে, বয়স উপেক্ষা করে, হাড়ের মটমট শব্দ তুচ্ছ করে দশবার তাঁকে ওঠবোস করতে হয়েছে।

শাস্তির দৃশ্যটা খুব আয়েস করে দেখলেন গোলোকবাবু। শুধু তিনিই নন, ভজবাবু ওঠবোস শুরু করার মুখে গোলোক স্যারের দুই নাতি আর এক নাতনিও এসে দরজায় দাঁড়াল। তাদের সে কী মুখচাপা দিয়ে হাসি!

দশবার ওঠবোস করার পর ভজবাবু যখন হ্যা-হ্যা করে হাঁফাচ্ছেন তখন গোলোকবাবু বললেন, "যা। আর কক্ষনো যেন ডান-বাঁ ভুল না হয় দেখিস।"

সেই অপমানের পর বেরিয়ে এসেই ভজবাবুর চেহারাটা একদম পাল্টে গেল। ভরসন্ধেবেলা দশবার ওঠবোস! হাতে পিস্তল থাকতেও!

ভাবতে-ভাবতে ভজবাবুর চেহারা হয়ে গেল খ্যাপা খুনীর মতো। সারা দুনিয়াকে তখন তাঁর দাঁতে-নখে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। মাথাটা এত তেতে গেছে যে, মনে হচ্ছিল এক্ষুনি মাথার ব্রহ্মতালুতে আগ্নেয়গিরির গহ্বরের মতো ছ্যাঁদা হয়ে মাথার ঘিলু তপ্ত লাভার মতো ছিটকে বেরিয়ে পড়বে।

রাস্তার কল থেকে খানিক ঠাণ্ডা জল মাথায় দিয়ে ভজবাবু আবার রওনা দিলেন। সব পাজি বদমাশকে আজ ঠাণ্ডা করতে হবে।

চৌরাস্তার মোড়ে একজন কনস্টেবল একজন রিকশাওলার কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছিল। প্রায়ই নেয়। রিকশাওলার গাড়িতে বাতি ছিল না, তাই ধরা পড়ে কাঁচুমাচু মুখে একটা সিকি ঘুষ দিচ্ছিল।

ঠিক এই সময়ে ভজবাবু পিস্তল বাগিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির।

বিকট একটা হুঙ্কার দিয়ে কনস্টেবলটাকে বললেন, "সিকি ফিরিয়ে দে।"

পিস্তল দেখে সিপাইটার চোখ লুচির মতো গোল হয়ে গেল, আর রিকশাওলাটা 'বাবারে' বলে গাড়ি ফেলে দৌড়।

"দে বলছি ফিরিয়ে।" ভজবাবু ধমকালেন।

কিন্তু সিপাই সিকিটা ফিরিয়ে দেবে কাকে! রিকশাওলাটা হাওয়া দিয়েছে যে। অগত্যা সে ভয়ে-ভয়ে ভজবাবুর দিকেই সিকিটা ছুঁড়ে দিয়ে জোড়হাতে বলল, "জান বাঁচিয়ে দিন ভজবাবু। আর কখনও—"

ভজবাবু নির্দয়। খুনীর গলায় বললেন, "ওঠবোস কর। দশবার।"

লোকটা খানিক গাঁইগুঁই করল বটে, কিন্তু শেষে রাজি হয়ে চৌরাস্তার ধারে সরে এসে একটু অন্ধকারে দশবার বৈঠকী দিল।

সিপাইটাকে ওঠবোস করিয়ে গায়ের ঝাল খানিকটা মিটল ভজবাবুর। ভারী খুশি হয়ে উঠলেন পিস্তলের গুণ প্রত্যক্ষ করে।

আবার র‍্যাপারের তলায় অস্ত্রটা লুকিয়ে নিয়ে সোজা চলে এলেন ইউরোপীয়ান ক্লাবে।

ক্লাবে অবশ্য এখন ইউরোপিয়ান আর কেউ নেই। বিলিয়ার্ড টেবিলের ওপরকার দামি কাপড়টা কে বা কারা ব্লেড দিয়ে কেটে তুলে নিয়েছে। টেবিল টেনিসের টেবিলের ওপর এখন দারোয়ানের মেয়ে আর জামাই শোয়। আর বল নাচের ঘরে টেবিল-চেয়ার পেতে কয়েকজন অফিসারগোছের লোক পয়সা দিয়ে তাস-টাস খেলে।

জুয়াখেলা দুচক্ষে দেখতে পারেন না ভজবাবু। বহুকাল ধরে তাঁর ইচ্ছে, এই জুয়ার চক্রটা ভাঙতে হবে।

ঘরে ঢুকেই ভজবাবু পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে বললেন, "হাতটাত তুলে ফেল হে। দেরি কোরো না।"

জুয়াড়িরা খেলায় মজে আছে। ভাল করে শুনতেও পেল না, কিংবা শুনলেও গ্রাহ্য করল না।

“কই হে!” বলে ভজবাবু এবার যে হুমকি ছাড়লেন তা অবিকল গোলোকবাবুর গলার মতো শোনাল।

এইবার চার-পাঁচজন জুয়াড়ি মুখ তুলে তাকিয়ে থ।

“এই যে ভজ বাজাড়ু!”

“হাতে পিস্তল যে! ও ভজবাবু, হল কী আপনার?...

ভজবাবু সেসব কথায় কান দিলেন না। তবে লোকগুলো যাতে ব্যাপারটাকে হালকাভাবে না নেয় তার জন্য হঠাৎ পিস্তলের নলটা ছাদের দিকে তাক করে গুড়ুম করে একটা “গুলি ছুঁড়লেন।

সেই শব্দে, নাকি গুলি লেগে কে জানে, ঘরের আলোর ডুমটা ফটাস করে ভেঙে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। আর সেই অন্ধকারে চার-পাঁচটা জুয়াড়ি প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল, “গুলি! গুলি! গেলাম! মলাম!”

ভজবাবু অন্ধকারে আপনমনে একটু হেসে বেরিয়ে এলেন।

পিস্তলের মজা এখনও শেষ হয়নি। এই তো সবে শুরু। ভাবলেন ভজবাবু। তারপর জোর কদমে আর-এক দিকে হাঁটতে লাগলেন।

চোট্টা গোবিন্দ ভাল লোক নয়। সে সুদে টাকা খাটায় লোকের গয়না জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার দেয়। এইসব করে সে এখন বিশাল বড়লোক। আসল নাম গোবিন্দচন্দ্র বণিক। কিন্তু সুদখোর আর অর্থলোভী বলে তার নামই হয়ে গেছে চোট্টা গোবিন্দ।

যারা টাকা ধার দিয়ে সুদ খায় বা বন্ধকী কারবার করে, তাদের বড় একটা ভাল হয় না। এই যেমন চোট্টা গোবিন্দরও ভাল কিছু হয়নি। তার ছেলেপুলেরা কেউ মানুষ হয়নি। দুটো ছেলেই বখে গিয়ে বাড়ি থেকে চুরি করে পালায়। তারপর একজন খুন করে জেলে গেছে, অন্যজন পাগল হয়ে পাগলাগারদে আছে। একটিই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল সাধ করে। কিন্তু সে-মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে বলে দিয়েছে, ওরকম সুদখোর বাপের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না। তাই মেয়েও বাপের কাছে আসে না।

পুলিশ চৌকির কাছেই চোট্টা গোবিন্দর বাড়ি। ছোট আর পুরনো হলেও বাড়িটা খুব মজবুত। জানালায় মোটা মোটা গরাদ, লোহার পাত মারা পুরু কাঠের দরজা আর তাতে আবার সব সময়ে তালা লাগানো থাকে। ঘরে বিশাল বিশাল কয়েকটা সিন্দুকে কয়েকশো ভরি বন্ধকী গয়না আর জমিজমার দলিল, কোম্পানির কাগজপত্র রাখা থাকে।

কৃপণ চোট্টা গোবিন্দর পয়সা থাকলে কী হয়, কখনও ভাল খাবে পরবে না। বুড়ো শকুনের মতো বাজারে ঘুরে ঘুরে যত সব শস্তার পচা বাসী তরিতরকারি কিনবে। বাজারের ভাল জিনিসটার প্রতি যার চোখ নেই, তাকে ভুজবাবু মোটেই ভাল চোখে দেখেন না। তার ওপর আবার লোকটা সুদখোর।

চোট্টা গোবিন্দর একটা স্বভাব হচ্ছে সব কাজ করার আগে পাঁজি দেখে নেবে। তিথি-নক্ষত্রের যোগ না দেখে সে কখনও কোনও কাজ করে না। এমনকী, দিন খারাপ থাকলে বন্ধক নেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখে।

হঠাৎ চোট্টা গোবিন্দর কথা মনে পড়তেই ভজবাবুর শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। হ্যাঁ, এ লোকটা মানুষের সমাজে এক বিদঘুটে কলঙ্ক, পৃথিবীর এক কুটিল শত্রু। এই নরাধমকে কিছু উত্তম শিক্ষা দেওয়া দরকার।

ভজবাবু এসে চোট্টা গোবিন্দর দরজায় কড়া নাড়লেন।

চোট্টা গোবিন্দ সাবধানী লোক। সন্ধের পর হুট বলতে সদর দরজা খোলে না। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্তুষ্ট হলে দরজা খোলে, নয়তো পরদিন আসতে বলে বিদায় দেয় লোককে। নিতান্ত কেউ দায়ে ঠেকলে জানালা দিয়ে গয়না টাকার লেনদেন হয়। তাও আবার তিথি-নক্ষত্র ভাল থাকলে।

কিন্তু ভজবাবুর কপালটা আজ নিতান্তই ভাল। যে সময়টায় তিনি কড়া নাড়ছিলেন, ঠিক সে সময়েই দরজার ভিতর থেকে হুড়কো খোলার শব্দ হল। কপাটের পাল্লা খুলে শার্দূল চৌধুরী বেরিয়ে আসছিল।

শার্দূল নামকরা শিকারি। তার যে কত বন্দুক পিস্তল ছিল তার লেখাজোখা নেই। সাতটা তেজী ঘোড়া ছিল, পাঁচটা গ্রে-হাউন্ড ব্লাড-হাউন্ড কুকুর, বাড়িতে বাগান, পুকুর, দারোয়ান ছিল। তা ছাড়া শার্দূলের চেহারাটাও ছিল পাহাড়ের মতো বিশাল; আর মনটা ছিল আকাশের মতো উদার। মুঠো মুঠো টাকা যেমন ওড়াত তেমনি বিলিয়ে দিত।

তবে একটা কারণে শার্দূলকেও ভজবাবু দেখতে পারেন না। শার্দূল বাজারে গিয়ে কখনও দরদাম করে না। দোকানদাররা যা দাম চায় তাই হাসিমুখে দিয়ে দেয় আর রাশি রাশি তরিতরকারি, মাছ, ডিম, মাংস কিনে ফেলে। শার্দূল যেদিন বাজারে যায় সেদিন দোকানদারদের পোয়াবারো, আর ভজবাবুর কপালে দুঃখ। সেদিন ভজবাবু যে-দোকানদারের কাছেই গিয়ে 'বাবা, বাছা' বলে দু পয়সা কমানোর চেষ্টা করেন সেই দোকানদারই তাঁকে না-চেনার ভান করে, পাত্তাই দিতে চায় না। কানাই মাছওলা একবার তো বলেই ফেলল, "বাজাড়ুদের মধ্যে ভদ্রলোক দেখলাম একমাত্র ওই শার্দূলবাবুকেই। আর তো সব ছ্যাঁচড়া।"

সেই থেকে ভজবাবুর রাগ।

শার্দূল চৌধুরীর অবশ্য আর সেই বাঘ-সিংহী মারার দিন নেই। অমিতব্যয়ের ফলে তার পয়সাকড়ি সব চলে গেছে, বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। বন্দুক, ঘোড়া, কুকুর সবই বেহাত। শার্দূলের সে চেহারাও আর নেই। রোগাটে লম্বা মানুষটাকে দেখলে মনে হয় বুঝি শার্দূলের বাবা। অত বুড়ো দেখায়।

শার্দূল ভজবাবুকে দেখে চোখ নাচিয়ে বলল, "কী খবর হে ভজু শিকারি?"

ভজবাবু জন্মেও কিছু শিকার করেননি। তবে কিনা ভাল বাজার করেন বলে শার্দূল তাঁকে মুনাফা-শিকারি বলে ডাকে। সংক্ষেপে শিকারি।

ভজবাবুর র‍্যাপারের তলায় তৈরি পিস্তল। কিন্তু যখন-তখন সেটা ব্যবহার করতে তো আর পারেন না। সতর্কতার একান্ত প্রয়োজন। তাই ভালমানুষের মতো বললেন, "ভিতরে চলুন শার্দূলবাবু, আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

শার্দূল ব্যস্ত হয়ে বলে, "কথা বলার সময় নেই। বাড়িতে আজ জলসা বসিয়েছি, লখনউ থেকে এক বড় ওস্তাদ এসেছে। তাকে মুজরো দিতে হবে বলে একটা সোনার পকেটঘড়ি বাঁধা দিয়ে গেলাম। জোর খানাপিনাও হবে।"

ভজবাবু দাঁত কিড়মিড় করলেন। অমিতব্যয়ী আর কাকে বলে। এই লোকটার এই দেদার টাকা খরচ করে ফুর্তি করা আর বাজারের দোকানদারদের আশকারা দেওয়া আজ বের করতে হবে। ভজবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "কথাটা একান্তই জরুরি। বেশি সময়ও লাগবে না।"

এই বলে শার্দূলকে একরকম ঠেলে দরজার ভিতরে এনে ভজবাবু দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে পিস্তল বের করে বললেন, "হ্যান্ডস আপ।"

শার্দূল বলে উঠল, "উঁ-হুঁ-হুঁ, আজ থিয়েটার দেখার সময় নেই। ওস্তাদজি বসে আছেন! তোমাদের পূর্বপল্লী কি এবার গোয়েন্দা-নাটক করছে নাকি?"

ভজবাবু হাসলেন, তারপর বিনাবাক্যে পিস্তলের মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে ঘোড়া টিপে দিলেন।

প্রচণ্ড শব্দ, আগুনের ঝলক আর ধোঁয়ার ভিতরে দাঁড়িয়ে ভজবাবুর নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বীর বলে মনে হল।

পিস্তলের শব্দে শার্দূল তিন হাত ছিটকে গেল। চোট্টা গোবিন্দ সিন্দুকের চাবি ট্যাকে গুঁজতে যাচ্ছিল, ঝনাত করে চাবির গোছাটা পড়ে গেল মেঝেয়।

ভজবাবু বললেন, "হ্যান্ডস আপ।"

এবার আর শার্দূলও চোট্টা গোবিন্দর হাত ওপরে তুলতে বেশি দেরি হল না। তবে কিনা চোট্টা গোবিন্দ ইংরিজি জানে না, 'হ্যান্ডস আপ' কথাটার মানে বুঝতে পারেনি বলে তার কিছু দেরি হয়েছিল। শার্দূল চৌধুরী কথাটার মানে বলে দিল তাকে; তখন সে তড়িঘড়ি হাত তুলে বলল, "বাবা ভজু, দোহাই তোমার। পাঁজিটা একটু দেখতে দাও।"

ভজবাবু হেসে বললেন, "পাঁজি দেখবেন? না পাঁজি দেখতে চান? পাঁজি দেখতে চাইলে একটা আয়না নিয়ে নিজের মুখখানা দেখুন, সবচেয়ে বড় পাজিকে দেখতে পাবেন।"

চোট্টা গোবিন্দ কাকুতি-মিনতি করে বলতে থাকে, "লক্ষ্মী ছেলে ভজু, অমন করে না, ছিঃ! আটটা কত মিনিটে যেন অমৃতযোগ আছে। যদি মারতেই হয় তবে সময়টা একটু দেখে মেরো বাপ। নইলে কোন নরকে গিয়ে পচব।"

"হাঃ হাঃ," হাসলেন ভজবাবু, তারপর ডাকলেন, "শার্দূল চৌধুরী!"।

ভজবাবুর গলায় ডাকটা বাঘের ডাকের মতো শোনাল। শব্দে কেঁপে ওঠে শার্দূল।আর ভজবাবু অবাক হয়ে নিজের গলায় হাত রেখে ভাবেন, "এও কি পিস্তলের গুণ? নইলে এরকম বাঘের আওয়াজ আমার গলায় এল কোত্থেকে?"

ভজবাবু পিস্তলটার গায়ে আদরে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "শুনুন শার্দূলবাবু আর গোবিন্দবাবু, আপনাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। গোবিন্দবাবু, আপনি সুদখোর, বন্ধকী মহাজন, মানবতার শত্রু, পৃথিবীর পঙ্কিলতম জঘন্যতম কী যেন! কী যেন! থাকগে। আর শার্দূলবাবু, আপনি আড্ডাবাজ, ফুর্তিবাজ, বেহিসাবি। দরিদ্রের রক্ত শোষণ করে, পৃথিবীর সম্পদ লুণ্ঠন করে, বাজারে গিয়ে নিজের ধনসম্পদের অপপ্রয়োগের দ্বারা মূল্যমানকে জঘন্যতম উর্ধ্বে তুলে দিয়ে যে অহমিকার ধ্বজা—এত কথারই বা কাজ কী! ওঠবোস করুন। দশবার।"

শার্দূল খুব মন দিয়ে ভজবাবুর কথা শুনছিল, ভজবাবু, থেমে যেতেই চোট্টা গোবিন্দর দিকে চেয়ে বলে উঠল, "পার্ট ভুলে গেছে?"

ভজবাবু ভয়ঙ্কর রেগে গিয়ে বললেন, "ভুলিনি! আরো শুনতে চান? আপনাদের লজ্জা হয় না শুনতে? ওঠবোস করুন, ওঠবোস করতে থাকে।

চোট্টা গোবিন্দ প্রায় কেঁদে ফেলে বলে উঠল, "আটটা পনেরো মিনিট উনচল্লিশ সেকেন্ড গতে অমৃতযোগ লাগবে। বাবা ভজু, ততক্ষণ বসে না হয় বিশ্রাম করো। বসে-বসে গালাগাল করো খানিক শুনি। বেশ বলছিলে

বাবা।”

ভজবাবু রেগে গিয়ে বললেন, “কথা কানে যাচ্ছে না নাকি? ওঠবোস করতে বলছি যে!”

“ওঠবোস!” চোট্টা গোবিন্দ ভারী বিমর্ষ গলায় বলে, “ওঠবোস করব সেই ভাগ্য কি আমার আছে বাপ! দু হাঁটুতে বাত। একবার বসলে আর উঠতে পারি না, ধরে তুলতে হয়। দশবার ওঠবোস করতে একটা বেলা চলে যাবে। তাও যদি তোমরা ধরাধরি করে করাও।”

ওদিকে শার্দূল শেষবার ওঠবোস করে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলল, “দশ। এবার ছুটি তো ভজু?”

ভজবাবু মাথা নেড়ে বলেন, “ছুটির দেরি আছে। গোবিন্দবাবু, আপনার কাছে তামা-তুলসী-গঙ্গাজল থাকে বলে শুনেছি। সেসব বের করুন।”

চোট্টা গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলে, “থাকে বাবা। যারা ধারকর্জ করতে আসে তাদের তামা-তুলসী-গঙ্গাজল ছুঁইয়ে শপথ করিয়ে নিই যাতে সুদ ঠিকমতো দেয়, মামলা-মোকদ্দমা না করে শাপশাপান্ত না দেয়।”

পিস্তল নাচিয়ে ভজবাবু বললেন, “সেসব বের করুন। আজ আপনাদের শপথ করিয়ে নেব।”

কাঠের আলমারি খুলে চোট্টা গোবিন্দ তাম্রপাত্রে গঙ্গাজল আর তুলসী-পাতা বের করে হাতে নিয়ে দাঁড়াল। ভজবাবুর পিস্তলের ইশারায় শার্দূল চৌধুরীও তাম্রপাত্রটি ছুঁয়ে দাঁড়াল।

ভজবাবু বললেন, “এবার বলুন, আর কখনও টাকা ধার দিয়া সুদ লইব না, বন্ধকের কারবার করিব না, মানুষের সর্বনাশ করিয়া ধনী হইব না—”

চোট্টা গোবিন্দ বলতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে শার্দূলও বলে, “আর কখনও টাকা ধার দিয়া সুদ লইব না, বন্ধকের কারবার—”

ভজবাবু বিরক্ত হয়ে শার্দূলকে বলেন, “আহা, ও কথা আপনার বলবার নয়। আপনার শপথবাক্য আলাদা।”

এরপর ভজবাবু শার্দূলকে দিয়ে শপথ করাতে থাকেন, “আর কখনও বেহিসাবি খরচ করিব না, ফুর্তি করিয়া টাকা উড়াইব না, আর বাজার করিতে গিয়া দরাদরি না করিয়া জিনিস কিনিব না—”

এবার শার্দূলের সঙ্গে সেসব কথা চোট্টা গোবিন্দও বলতে থাকে, “আর কখনও বেহিসাবি খরচ করিব না, ফুর্তি করিয়া টাকা উড়াইব না, আর বাজার করিতে গিয়া—”

ভজবাবু চোট্টা গোবিন্দকে ধমক দিলেন, “ওসব আপনাকে কে বলতে বলেছে? আপনি বরং সুদের কারবার ছেড়ে এবার থেকে ফুর্তি করেই টাকা ওড়াবেন। আপনার সেইটেই দরকার।”

“তাই করব বাবা। তবে বুড়ো বয়সে কিছু মনে থাকে না। যা সব শপথ করালে তা মনে থাকলে হয়।”

ভজবাবু একটু তৃপ্তির হাসি হেসে বেরিয়ে এলেন। এবার যাবেন বাজারে। কানাই মাছওলাকে টিট করতে না পারলে সুখ নেই।

কিন্তু বৈকালী বাজারে আজ কানাই বসেনি। মেছুনী অনঙ্গবালা ভজবাবুকে চুপি চুপি বলল, “আসবে কী করে বাবু, আজ যে কানাইয়ের কালীপুজো।”

“কালীপুজো! কালীপুজো তো কবে হয়ে গেছে।”

অনঙ্গবালা পান-খাওয়া মুখে একটু হেসে বলে, “সে পুজো নয় বাবু। আপনাকে বলেই বলছি, আজকের পুজো হচ্ছে ডাকাতি করার পুজো।”

"বটে!" ভজবাবুর মুখখানা অসুরের মুখের মতো হয়ে গেল। বাজার থেকে বেরিয়ে তিনি সোজা শহরের উত্তরদিকে যাওয়ার রাস্তায় পড়লেন। বেগে হাঁটছেন আর আপনমনে মাঝে মাঝে বলছেন, "বটে! বটে! বটে! বটে!"

বাঁশঝোপের আড়াল থেকে ভজ বাজাড় বই দেখলেন, শুনলেন। তারপর আপনমনে বলে উঠলেন "বটে!"

আলোয়ানের তলা থেকে পিস্তলটা বের করে একটু আদর করলেন অস্ত্রটাকে। পিস্তল থাকলে আর কোনও ভয় নেই। পিস্তলের সামনে সব ডাকাত, বদমাশ, চোর, গুণ্ডা ঠাণ্ডা।

ওদিকে ডাকতরা খুব চিল্লামিল্লি করছে। তাদের আনন্দ আর ধরে না। পুজো হয়ে গেছে। বলির পাঁঠা কাটাকুটি করে মস্ত কড়াইতে কাঠের জ্বালে রান্না চেপে গেছে। গোটা পঁচিশ মশাল জ্বলছে চারধারে। চারদিকটা আলোয় আলো।

এদিকে মাংসের গন্ধে ভজবাবুর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আজ সেই দুপুরের পর এ পর্যন্ত তাঁর কিছুই খাওয়া হয়নি। বড্ড খিদে পেয়ে গেছে। তার ওপর বাঁশঝাড় থেকে হাজার হাজার মশা পিন্ পিন্ করে উড়ে এসে ছেঁকে ধরেছে তাঁকে।

ইচ্ছে ছিল ডাকাতদের ওপর আরো কিছুক্ষণ নজর রাখবেন। ওরা যখন ডাকাতিতে বেরোবে ঠিক তখন গিয়ে যমের মতো পিস্তল হাতে মুখোমুখি হবেন। কিন্তু খিদে আর মশার জ্বালায় ভজবাবু বসে থাকতে পারলেন না। আহাম্মক মশাগুলো তো পিস্তলের মর্ম বোঝে না যে ভয় পাবে। তাই ভজবাবু ভাবলেন তাড়াতাড়ি ডাকাতগুলোকে শিক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে পেট ভরে ভাত খাবেন। সারাদিন ভারী ধকল গেছে।

এই ভেবে ভজবাবু ব্যাপারটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে পিস্তল বাগিয়ে ধরে বাঘের গলায় 'খবরদার! খবরদার!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে চার-পাঁচ লাফ দিয়ে কালীবাড়ির চাতালে পড়লেন। তারপরই গুড়ুম করে একটা গুলি আকাশে ছুঁড়ে বললেন, "হ্যান্ডস আপ। সবাই হাত তোলো।"

ভজবাবুর সেই চেঁচানি আর গুলির শব্দে ডাকাতদের মধ্যে প্রথমটায় এক প্রচণ্ড আতঙ্ক দেখা দিল। ভড়কে গিয়ে সবাই এদিকে সেদিক পাঁই-পাঁই করে পালাতে লাগল। একটা মোটা ডাকাত মাংসের ঝোল হাতায় তুলে নুন-ঝাল পরীক্ষা করছিল সে তাড়াহুড়োয় পালাতে গিয়ে সেই ফুটন্ত ঝোল হাতা থেকে মুখে ঢেলে গরমে মাংসের কড়াইয়ের জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়তে গিয়ে ফুটন্ত মাংসের কড়াইয়ের মধ্যে একটা পা ডুবিয়ে দিল। তারপর 'বাবা রে গেছি রে' বলে লেংচে লেংচে খানিক দূরে গিয়ে পড়ল।

কানাই দায়ে ধার দিচ্ছিল, আচমকা ভজবাবুর মূর্তি আর পিস্তলের শব্দে সে মনে করল, পুলিশ এসেছে। সে হাঁটু গেড়ে বসে খুব অভিমানের সুরে হাতজোড় করে বলতে লাগল, "এ-সব কি ঠিক হচ্ছে পুলিশ সাহেবদের? আজ সকালেই দু সের বড় বড় কই মাছ দারোগাবাবুদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি, তবু এই মন্দিরে এসে জুলুম কেন? নিরালায় বসে কয়েকজন ভক্ত মায়ের পুজো করছে, তার মধ্যে এসে এই হুজ্জতের কোনও মানে হয়?

কিন্তু ভজবাবুর কানে সে-সব কথা যাচ্ছে না। ডাকাতদের পালাতে দেখে তাঁর সাহস দ্বিগুণ বেড়ে গেল। সোল্লাসে লাফাতে-লাফাতে বলতে লাগলেন, "সব ব্যাটাকে মেরে ফেলব। খুন করব। তারপর ফাঁসিতে ঝোলাব। আজ তোদেরই একদিন কি আমারই একদিন।"

তারপর হঠাৎ কানাইকে দেখতে পেয়ে ভজবাবু এক লাফে তার সামনে এসে নাকের ডগায় পিস্তলের নল ঠেকিয়ে বললেন, "কানাই।"

ভজবাবুকে দেখে কানাই অবাক। পিস্তল দেখে আরো অবাক। কাঁপা গলায় বললেন, "আজ্ঞে!"

"এবার?" ভজবাবু একগাল হেসে বললেন।

কানাই কাঁপা গলায় বলে, "রোজ তো আপনাকে নিজের ক্ষতি করে কম দামে মাছ দিই ভজবাবু!"

"আজ সকালে যে বড় কৈ মাছগুলো লুকিয়েছিলি।"

"পরে তো বের করে দিচ্ছিলাম ভজবাবু, কেবল গোয়েন্দাচরণ এসে—"

"চোপ," বলে ভজবাবু এক ধমক দিয়ে বললেন, "বেশি কথা বলতে হবে না। দশবার ওঠবোস কর। তাড়াতাড়ি।"

কানাই খুব বাধ্য ছেলের মতো ওঠবোস করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আর দরকার হল না। কোথা থেকে একটা মাছ ধরার জাল উড়ে এসে ভজবাবুকে আপাদমস্তক মুড়ে ফেলল। হ্যাঁচকা টান খেয়ে ভজবাবু চাতালে গড়াগড়ি।

মাছের জালের দড়িটা হাতে নিয়ে ডাকাতের মেজ সর্দার সেই সুন্দরপানা ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল, "ওরে, তোরা সবাই আয় রে। লোকটাকে ধরেছি। আজ বড় করে পুজো হবে ফের। আর সেই পুজোতে নরবলি হবে।"

সেই শুনে ভজবাবু মূর্ছা গেলেন। যতক্ষণ হাতে পিস্তল ছিল ততক্ষণ ভজবাবু আর ভজবাবু ছিলেন না, মহাবীর হয়ে গিয়েছিলেন। যেই পিস্তলটা হাত থেকে ছিটকে গেল অমনি তিনি রোজকার ভিতু, নিরীহ, গোবেচারা ভজহরি হয়ে গেছেন।

মূর্ছা যখন ভাঙল তখন দৃশ্য ভজবাবুর আবার মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম। দেখেন ডাকাতরা আবার সব জমায়েত হয়েছে। চারদিকে মহা উল্লাস চলছে। তিনি টের পেলেন তাঁর হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, গলাটা

হাড়িকাঠে আটকানো। ঢাক আর কাঁসিতে কারা যেন বলির বাজনা বাজাচ্ছে। কানাই মাছওলা বলছে, 'এই ছ্যাঁচড়া বাজাড়ুটার জন্য আর মাছ বেচে সুখ ছিল না। আজ এটাকে নিকেশ করতেই হবে।'

রোগা পুরুতমশাই এসে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভজবাবুর কপালে একটা সিঁদুরের তিলক এঁকে দিলেন। ডাকাতরা চেঁচাল, 'জয় মা জয় মা!'

বেশ রাত হয়েছে।

মনোজদের বাড়ির অবস্থা বেশ থমথমে। হারানো ছবিটা পাওয়া যায়নি বলে রাখোবাবু প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সন্ধেবেলার পর যেসব খবর এসেছে তাতে তাঁর রাগ জল হয়ে প্রচণ্ড ভয় ঢুকে গেছে।

প্রথমেই থানা থেকে একদল সেপাই নিয়ে দারোগা নিশিকান্ত এসে হাজির। নিশিকান্ত ভারী কড়া দারোগা, একবার তাঁর দুই ছেলে মারপিট করে একজন অন্যজনের মাথা ফাটিয়েছিল বলে তাদের দুদিন করে হাজতবাস করিয়েছিলেন। আর একবার তাঁর স্ত্রী রাগ করে বাপের বাড়ি যাওয়ায় স্ত্রীর নামে ওয়ারেন্ট বের করেন। শুধু অন্যের বেলাতেই নয়, নিজের বেলাতেও তিনি সমান কড়া। যদি চোর ডাকাত ধরতে না পারেন, কোনও অপরাধের যদি কিনারা না হয় তবে তিনি নিজে নাকে খত দেন, উপোস করেন, কখনও বা সেপাইকে ডেকে বলেন—আমাকে দশ ঘা বেত মার তো! ভারী কালীভক্ত লোক। যদি কেউ নিশি দারোগাকে কালীর গান শোনায় তবে তাঁর ভর হয়। চিতপাত হয়ে পড়ে গোঁ-গোঁ করে মুখে গ্যাঁজলা তোলেন।

নিশি দারোগাকে সবাই তাই সমঝে চলে।

সন্ধেবেলা এসেই তিনি বাইরে থেকে হাঁক ছাড়লেন, "ভজবাবু, আমরা বাড়ি ঘিরে ফেলেছি, পালাবার চেষ্টা করবেন না বা গুলি ছুঁড়বেন না। যদি গুলি ছোঁড়েন তবে আমরাও ছুঁড়ব। যদি পালান তো আমরাও পালাব—থুড়ি আমরা আপনাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলব। কোন চালাকি করার চেষ্টা করবেন না।"

এমনিতে নিশিকান্ত যতই কড়া হোন না কেন, লোকে বলে তিনি ভারী ভিতু লোক। ঘুষ নেন না বটে তবে ঘুঁষিও চালান না। গুলিটুলি চালাতেও তাঁর অনিচ্ছে ভীষণ। চোর-ডাকাতদের পিছু নেওয়া বা বিপজ্জনক লোককে গিয়ে ধরা-টরার কাজেও তিনি নেই।

তবু তাঁর হাঁক-ডাক শুনে বাড়ির লোক সব হন্তদন্ত হয়ে বেরোল।

দুঃখবাবু মনোজ, সরোজ আর পুতুলকে পড়াচ্ছিলেন। গণেশবাবু একমনে একটা তান ধরেছেন। পুলিশের বুটের আওয়াজ আর গলার দাপট শুনে দুঃখবাবু তাড়াতাড়ি উঠে সরোজ, মনোজ আর পুতুলকে বললেন, "চলো ভিতরবাড়িতে যাই। এখানটায় গরম হচ্ছে।"

গণেশবাবুরও সুরটা কেটে গেল। বাড়িতে পুলিশ এসেছে টের পেয়ে তিনি তানপুরাটা বগলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন। ইচ্ছে, পালিয়ে যান। কিন্তু বেরোতেই বাগানের ফটক থেকে একেবারে মুখের ওপর একটা টর্চের আলো এসে পড়ল। সেই আলোতে একটা রাইফেলের নল বা পুলিশের লাঠি যাহোক একটা বস্তুও দেখা গেল। নিশি দারোগা হুংকার ছাড়লেন, "বন্দুক ফেলে দিয়ে হাত তুলুন।"

গণেশবাবু চিঁচিঁ করে বললেন, "বন্দুক নয়, তানপুরা।"

"তানপুরাই ফেলুন।"

এ সময়ে রাখোবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, "এ-সব কী। কী হয়েছে নিশিবাবু?"

নিশিকান্ত অত্যন্ত গম্ভীরমুখে বললেন, "আপনার ভাই ভজহরিবাবুর নামে ওয়ারেন্ট আছে।"

"ওয়ারেন্ট মানে? কিসের ওয়ারেন্ট?"

এই শীতেও নিশিকান্ত কপালের ঘাম মুছে বললেন, "একজন মার্ডারারকে ঘরে লুকিয়ে রেখে আর ভান করবেন না রাখোবাবু। দয়া করে ওঁর পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে হাত দুটো ভাল করে বেঁধে আমাদের কাছে এনে দিন।"

"কার পিস্তল? কে মার্ডারার? কাকে বাঁধব?"

নিশিকান্ত খুব বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন, "সবই তো জানেন রাখোবাবু, কেন অভিনয় করছেন? ভজবাবু যে এত বড় মার্ডারার তা যদি আগে জানতাম! ভদ্রবেশে এত বড় খুনি এতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছিল কেউ টেরই পায়নি। কত দারোগাই তো এ শহরে এর আগে এসেছে, কেউ ধরতেও পারেনি। কিন্তু এবার ভজবাবুর খেলা শেষ। আমার হাতেই আজ এত বড় রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে। কই, নিয়ে আসুন তাকে! সাবধান, যখন আনবেন তখন যেন পিস্তলটা হাতে না থাকে।"

রাখোবাবু আকাশ থেকে পড়ে বললেন, "ভজু মার্ডারার?"

পিছন থেকে আদ্যাসুন্দরী বলে উঠলেন, "এ দারোগাটাকে পেত্নীতে পেয়েছে।"

ঠাকুমা কেঁদে উঠে বললেন, "বন্দুক পিস্তল দূরে থাক বাবা, আমার ভজু দা দিয়ে বাঁশ পর্যন্ত কাটে না, পাছে বাঁশ ব্যথা পায়।"

কিরমিরিয়া দারোগা পুলিশ দেখে বিলাপ করে কাঁদছিল, "ওগো, আমাকে ধরে নিয়ে যেও না গো। আমি কালই মুলুকমে চলে যাব গো। ভজবাবু কেন পিস্তল দিয়ে খুন করল গো!"

"চুপ কর তো কিরমিরিয়া!" বলে রাখোবাবু ধমক দিলেন।

গণেশবাবু তানপুরাসুদ্ধু হাত ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, "হাত দুটো কি নামাব দারোগাবাবু?"

দুঃখবাবু পড়ার ঘরের দরজায় খিল এঁটে জানালা দিয়ে দৃশ্যটা দেখেছেন। তাঁর পাশে সরোজ, মনোজ, পুতুল।

সরোজ বলল, "পিস্তল?"

মনোজ বলল, "পিস্তল।"

পুতুল বলল, "পুতুলের বাক্সে ছিল।"

দুঃখবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "আঃ, গোল কোরো না। ইম্পর্ট্যান্ট কথা হচ্ছে সব, শুনতে দাও।"

গোলযোগ শুনে পাড়ার লোকও এসে জড়ো হয়েছে কম নয়। তবে তারা একটু দূরে দূরে।

নিশিকান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, "শুনুন রাখোবাবু, আসল অপরাধীকে কোনওদিন বাইরে থেকে চেনা যায় না। আমাদের ক্রিমিনোলজিতে দেখবেন, বেশির ভাগ অপরাধীই দেখতে এবং আচরণে অতি নিরীহ। আর এদের অপরাধ-প্রবণতা অনেক নিকট আত্মীয়স্বজনও টের পায় না। কাজেই ভজবাবুকে আপনারা যত নির্দোষ ভেবে এসেছেন ততটা মোটেই নয়। এ শহরের অন্তত দশ বারোজন লোক ভজবাবুর শিকার হয়েছেন। প্রত্যেকেই অল্পের জন্য বেঁচে যান। এমন কী, আমার একটা সেপাইকে পর্যন্ত তিনি দশবার ওঠবোস করিয়েছেন। আর কী করেননি শুনি। হরশঙ্কর গয়লাকে প্রায় মেরে ফেলেছিলেন, সে হাতে পায়ে ধরে বেঁচে

যায়। ইউরোপিয়ান ক্লাবে গিয়ে গুলি ছুড়েছেন, গোবিন্দবাবু আর শার্দূলবাবুকে আধমরা করেছেন, বাজারেও গিয়েছিলেন কাকে যেন তাক করতে। সবাই এসে থানায় রিপোর্ট করেছে। আমরা ইয়ার্কি করতে আসিনি রাখোবাবু। বাড়ি ঘেরাও করা হয়েছে, ভজবাবুকে বের করে দিন।"

রামু এতক্ষণ বারান্দায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। চেঁচামেচি শুনে উঠে এসে বলল, "ভজবাবু? ভজবাবু তো সেই সন্ঝাবেলা পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বললেন কী, আজ সব গুণ্ডা বদমাশ আর খারাপ লোককে টিট করে আসবেন।"

রাখোবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "তা সেটা এতক্ষণ বলিসনি কেন?"

রামু কাঁচুমাচু হয়ে বলে, "বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হরশঙ্কর পাহলোয়ান আমাকে এমন ঘিস্সা দিল কি আমার তবিয়ত খারাপ হয়ে গেল।"

দারোগাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "রাখোবাবু এ লোকটার নামই কি রামু?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে এর নামেও একটা মোষ চুরির নালিশ আছে। এ আজ হরশঙ্করের একটা দুধেল মোষ চুরি করে এনে আপনাদের গোয়ালে বেঁধে রেখেছিল।"

এই বলে দারোগাবাবু তাঁর সিপাইদের দিকে ফিরে বললেন, "লোকটাকে আগে সার্চ করে দেখ আর্মস আছে কিনা। তারপর অ্যারেস্ট করো।"

শুনে রামু সটান মাটিতে শুয়ে চেঁচাতে থাকে, "হনুমানজিকে কিরিয়া হো পুলিশ সাহেব, চোরি আমি কভি করি না।"

নিশিকান্ত সে কান্নায় কর্ণপাত করলেন না। রাখোবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "ভজবাবু বাড়িতে নেই বলছেন?"

রাখোহরিবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "কথায় বিশ্বাস না হয় খুঁজে দেখতে পারেন।"

"সে তো দেখতেই হবে। তবে আমার ভয় হচ্ছে, এখনো যদি ফিরে থাকেন তবে এর মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও আরো কয়েকজনকে খুন করেছেন বা করছেন ভজবাবু।"

ঠাকুমা ডুকরে উঠে বলেন, "না না, সে যে মশা মারতে মায়া করে।"

ঠাকুরঝি পরিষ্কার গলায় বললেন, "দ্যাখো বাবা দারোগা, সার্চ করার সময় জুতো পরে ঘরে ঢুকতে পারবে না বলে দিচ্ছি। তোমার সেপাইদেরও জুতো খুলতে বলো। এই রাতে গোবরছড়া দিয়ে মরব নাকি, সে হবে না।"

এদিকে তখন ডাকাতে কালীবাড়িতে ভজবাবু হাড়িকাঠে পড়ে আছেন। একটা জোয়ান ডাকাত রামদা হাতে দাঁড়িয়ে। বাজনদাররা বলির বাজনা বাজাচ্ছে। দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছেন না ভজবাবু। কয়েকবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইচ্ছে করে যে অজ্ঞান হওয়া যায় না সেটা বুঝে মা কালীকে ডাকতে লাগলেন। একমনে বলতে লাগলেন, "আমাকে অজ্ঞান করে দাও মা। "

একটা ঝাঁকড়া চুলওলা ডাকাত আর একটার কানে গোঁজা বিড়ি নিয়ে খেয়ে ফেলেছে বলে দুজনে খুব ঝগড়া হচ্ছিল। পা-পোড়া মোটা ডাকাতটা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। ডাকাতের মেজ সর্দার সেই সুন্দরমতো ছেলেটা

ভজবাবুর পিস্তল নিয়ে আমোদ করার জন্যই গোটা দুই দুমদাম গুলি ছুড়ল আকাশের দিকে।

ভজবাবুর বড় তেষ্টা পেয়েছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকটা চড়চড় করছে। প্রাণপণে বললেন, "জল!"

বিড়ি-চোর ডাকাতটা সবচেয়ে কাছে। সে ভজবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "চোপ! যার বলি হবে তার আবার অত কথা কী? আর ক মুহূর্ত পরেই সব খিদে তেষ্টা মিটে যাবে।"

ওপাশ থেকে কানাই জিজ্ঞেস করল, "কী বলছে রে বাজাড়টা?"

"জল চায়।"

কানাইয়ের মায়া হল, বলল, "দে না একটু।"

খাঁড়া হাতে লোকটা খাঁড়া নামিয়ে বলল, "ওরে, তোদের আর কতক্ষণ লাগবে। বলি দিবি বলে ফেলে রেখেছিস লোকটাকে তো দেরি করছিস কেন? লোকটার এ ভাবে পড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে না?"

বিড়ি-চোর ডাকাতটি ঘটি করে জল আনছিল, সুন্দর মতো ছেলেটা চোখের ইঙ্গিতে তাকে নিষেধ করে এক গ্লাস শরবত নিয়ে গিয়ে কাছে বসে ভজবাবুকে বলল, "হাঁ করুন।"

ভজবাবু চোখ বুজে রেখে হাঁ করলেন। ডাকাতটা তাঁর মুখে খানিকটা শরবত ঢালতেই শিউরে উঠে বিষম খেলেন ভজবাবু, খানিকটা পেটে গেল, খানিকটা ফেলে দিয়ে বললেন, "এ কী রে বাবা, এ তো জল নয়।"

"জলের চেয়ে দামি জিনিস। আর একটু খান। আজকের দিনে খেতে হয়। আমরা সবাই খাচ্ছি তো।"

তেষ্টায় বুক কাঠ, না খেয়ে করেন কী ভজবাবু! আবার হাঁ করে আর একটু মুখে নিয়ে চুকচুক করে খেলেন। এবার অতটা খারাপ লাগল না। আবার খেলেন। আবার।

কিছুক্ষণ পরে চোখে ঘোর-ঘোর দেখতে লাগলেন। শরবতের মধ্যে কী ছিল কে জানে, ভজবাবুর মাথাটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যেতে লাগল। ভয়ডর কেটে গিয়ে ঠাণ্ডা শরীরটা গরম হয়ে উঠতে লাগল। খুব একটা তেজ এল মনের মধ্যে। হাড়িকাঠে গলা দিয়েও হঠাৎ হুংকার ছাড়লেন, "সব ব্যাটাকে দেখে নেব! সব ব্যাটাকে দেখে নেব!"

সেই হুংকার শুনে রোগা আর ভিতু ডাকাতরা একটু দূরে সরে বসল। মেজ সর্দার ভজবাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "এই তো চাই। এ না হলে বাপের ব্যাটা! তা ভজবাবু, আজ চলুন না আমাদের সঙ্গে ডাকাতি করতে, দেখি কেমন সাহস আপনার?"

ভজবাবু একটা ফুঃ করে বললেন, "এ আর কী কথা! এক্ষুনি চলো। কার বাড়ি লুট করবে?"

"রাজবাড়ি।"

"আরে দূর দূর। রাজবাড়িতে আছে কী? আছে একটা ঘুঁটের পাহাড় আর নটে শাকের জঙ্গল। রাজাদের কি আর সেই দিন আছে। লুটবে তো চলো একটা ব্যাঙ্ক লুট করি।"

"না। আমরা আজ রাজবাড়ি লুট করব ঠিক করেছি। সেখানে মাটির নীচে অনেক টাকা আছে। ভয় পাবেন না তো ভজবাবু?"

ভজবাবু হাড়িকাঠে শুয়ে থেকেই খুব হোঃ হোঃ করে হেসে বললেন, "ভজহরি কখনও ভয় কাকে বলে জানে না। হাড়িকাঠের খিলটা খুলে আমার হাতে একটা পিস্তল দাও, তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।"

মেজো সর্দার বলল, "আমরা পিস্তল বন্দুক রাখি না। বড় সদারের একটা বন্দুক আছে, কিন্তু তার আজ বড় আমাশা হয়েছে বলে সে যাচ্ছে না। আর আপনার এ পিস্তলেও আর গুলি নেই।"

"ছ্যাঃ ছ্যাঃ কেমন ডাকাত হে তোমরা যে পিস্তল-বন্দুক রাখো না। ঠিক আছে, দারোগাবাবুকে বলে আমি তোমাদের পিস্তলের বন্দোবস্ত করে দেব। আমাকে আজকের মতো একটা রাম দা-ই দাও, কী আর করা!"

মেজ সর্দার হাড়িকাঠের খিল খুলে দিতেই ভজবাবু লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চেঁচিয়ে বললেন, "অ্যাটেনশন।"

সেই চেঁচানিতে ডাকাতরা আবার ভয় খেয়ে চমকে উঠল। মেজ সর্দার হেসে বলল, "তোরা সব সোজা হয়ে দাঁড়া। আজ ভজবাবুই আমাদের সর্দার।"

ভজুবাবুও মাথা নেড়ে বললেন, "আলবাত আমি সর্দার। এই কানাই, রামদা দে একটা।"

কানাই ভয়ে ভয়ে একটানা রামদা এগিয়ে দিতেই ভজবাবু সেটা হাতে নিয়ে তিন চারটে লাফ মেরে বাঁই বাঁই করে ঘোরালেন চারদিকে। তারপর একগাল হেসে বললেন, "দেখলে তো সবাই!"

সবাই তারিখ করে বলল, "বাঃ! বহুত খুব!"

ভজবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "এক বাটি মাংস নিয়ে আয়।"

বিড়ি-চোর এক বাটি ভর্তি মাংস নিয়ে এল। ভজবাবু রামদা পাশে নিয়ে বসে বললেন, "তোরাও বসে যা। রাতে অনেক কাজ আছে।"

আদ্যাসুন্দরী দেবী এক হাতে লাঠি আর এক হাতে গুলতি নিয়ে উঠোনে ঢুকবার দরজা আটকে দাঁড়িয়ে রক্ত-জলকরা গলায় হেঁকে বললেন, "দ্যাখো বাবা দাবোগা, ভাল চাও তো বাড়িতে ঢুকবার আগে তোমার সেপাইদের জুতো খুলতে বলল, আর তুমিও খোলা। জুতো পরে যে ঢুকবে, তার আমি রক্ষে রাখব না।"

নিশি দারোগা গম্ভীর হয়ে বললেন, "ডিউটির সময়ে আমাদের জুতো খুলবার আইন নেই পিসিমা, আমাদের কাছে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না। মারাত্মক খুনিকে ধরতে এসেছি আমরা, ইয়ার্কির সময় নেই।"

আদ্যাসুন্দরীদেবী জীবনে কাউকে ভয় করেননি। গত বছরও গ্রীষ্মকালে একটা চোর জানালা দিয়ে গেঞ্জি চুরি করার চেষ্টা করেছিল বলে আদ্যাসুন্দরী হাত বাড়িয়ে তার কান মলে দেন। তা ছাড়া গুলতিতে তাঁর হাতের টিপের কথাও সবাই জানে। ব্রত-পার্বণে আম্রপল্লব বা বেলপাতা দরকার হলে তিনি নিজেই গাছে গুলতি মেরে-মেরে আমপাতা বেলপাতা পেড়ে আনেন। কাজেই আদ্যাসুন্দরী দেবীকে যারা জানে, তারা চট্ করে এ-বাড়িতে ঢোকে না, একটু চিন্তা করে ঢোকে।

কিন্তু নিশি দারোগা করেন কী? চাকরি বাঁচাতে তাঁকে তো বাড়িতে ঢুকতেই হবে, তা ছাড়া এত লোকের চোখের সামনে যদি তাঁকে বা সেপাইদের জুতো খুলতে হয়, তবে সেটা পুলিশের পক্ষে বেইজ্জতির ব্যাপার।

কিন্তু আদ্যাসুন্দরীদেবীর এক কথা। "খুনি ধরতে বারণ করছে কে? কিন্তু জুতো পায়ে বাড়িতে ঢুকতে পারবে না। রাজ্যের নোংরা আবর্জনা মাড়িয়ে এসেছ বাবা, রাত-বিরেতে কে গোবর গুলে ছড়া দেবে।"

দারোগাবাবু মিনমিন করে বললেন, "আইন নেই, পিসিমা। আমরা ছাপোষা মানুষ, কেন আমাদের লাঠিসোটা দেখাচ্ছেন?"

"দেখাচ্ছি কী! যে ঢুকবে জুতো নিয়ে, তার কপালে লাঠির ঘা আছে আজকে।"

কিন্তু সেপাইরা তো আর ঘাসজল খায় না। তারাও নানারকম লেক চরিয়েছে। মেলা ফন্দি-ফিকির জানে।

হঠাৎ হল কী, সেপাইরা সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তারপর অন্ধকারে এধার সেধার দিয়ে টপাটপ সব লাফিয়ে-লাফিয়ে দেওয়াল ডিঙোতে শুরু করে দিল। বুট-সমেত সেপাইরা ঝুপঝাপ করে ভিতরের উঠোনে

পড়ছে। আদ্যাসুন্দরীদেবী মহা খাপ্পা হয়ে ছোটাছুটি করে হাতের কাছে যাকে পাচ্ছেন তাকেই ফটাফট লাঠি লাগাচ্ছেন। কিন্তু একা তিনি কতজনের সঙ্গে পেরে উঠবেন? ওদিকে দরজা ছাড়া পেয়ে আরও সেপাই ঢুকে পড়েছে উঠোনে। আদ্যাসুন্দরী দেবী চেঁচাচ্ছেন, "ডাকাত! ডাকাত! ওরা তোরা পুলিশে খবর দে!"

নিশি দারোগা কপালের ঘাম মুছে রাখোবাবুকে বললেন, "ওরে বাবা, জীবনে এরকম সিচুয়েশন ফেস করিনি। তা আপনাদেরও বোধহয় এ বাড়িতে একটু ভয়ে-ভয়েই থাকতে হয়, তাই না? ওরকম ডেঞ্জারাস পিসিমা আর মার্ডারার ভাই বাড়িতে থাকলে তো মহা বিপদের কথা মশাই।"

রাখোবাবু খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "কোথাও কিছু-একটা গণ্ডগোল হচ্ছে নিশিবাবু।"

"সে তো হচ্ছেই।" নিশি দারোগা গম্ভীর হয়ে বলেন, "খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। আমি যতই শান্তি চাই, ততই অশান্তি এসে কপালে জোটে। আপনারা কিছুতেই আমাকে দু দণ্ড চুপচাপ বসে মায়ের নাম করতে দিচ্ছেন না।"

গণেশবাবু এখনও তানপুরা ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। এবার একটু সাহস পেয়ে বললেন, "দারোগাবাবু, তানপুরাটা কি নামাব?"

দাবোগাবাবু অবাক হয়ে বলেন, "তানপুরা নামাবেন, তা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? তানপুরা নামাতে তো পুলিশের পারমিশন লাগে না! তবে এটা গান-বাজনার সময় নয় বটে। তা তানপুরা তুলল কে?"

গণেশবাবু বললেন, "আপনি আমাকে হাত তুলতে বললেন যে!"

"তানপুরা তুলতে বলিনি তো!"

"হাতে তানপুরা ছিল যে!"

দারোগাবাবু একগাল হেসে বললেন, "তাই বলুন, হাতে তানপুরা ছিল। তা তানপুরা নিয়ে যাচ্ছিলেন কোথায়?"

গণেশবাবু যে পালাবার তালে ছিলেন, তা আর বললেন না, একটু অপ্রস্তুতভাবে বললেন, "কোথাও বিশেষ নয়। এই একটু বেড়াতে যাচ্ছিলাম আর কী।"

দারোগাবাবু ভারী অবাক হয়ে বলেন, "লোকে ছাতা বা লাঠি হাতে বেড়াতে বেরোয় বটে, কিন্তু তানপুরা নিয়ে কাউকে বেড়াতে শুনিনি তো!"

এইসব কথা যখন হচ্ছে তখন হঠাৎ ভিতর-বাড়ি থেকে সেপাইদের আর্ত চিৎকার শোনা গেল। ঝপাঝপ দেয়াল ডিঙিয়ে সেপাইরা এ-পাশে পড়ে পালাচ্ছে।

দেখে নিশি দারোগাও 'বাবা রে বাবা' বলে চেঁচাতে লাগলেন। রাখোবাবু তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনারা কিছু হয়নি। ও নিশিবাবু, আপনি চেঁচাচ্ছেন কেন? আপনার কিছু হয়নি।"

হয়েছে কী, বাইরে যখন এত সব কাণ্ড চলছে, তখন বৈজ্ঞানিক হারাধন তার গবেষণাগারে গবেষণার কাজে মগ্ন হয়ে ছিল। চারদিকের এত হইচই তার কানেও যায়নি।

ওদিকে মনোজ সরোজ আর পুতুল যখন দেখল, ঠাকুরঝির সঙ্গে পুলিশদের মহা হাঙ্গামা বেধেছে, আর পুলিশ জোর করে ঘরে ঢুকছে তখন তিনজন আর থাকতে পারল না।

মনোজ বলল, "ছোটকাকা।"

সরোজ বলল, "ঠিক বলেছিস! ছোটকাকা ছাড়া উপায় নেই।"

পুতুল বলল, "ছোটকাকা ঠিক শিক্ষা দিয়ে দেবে।"

বলতে বলতে তিনজন দৌড়ে গিয়ে দরজার খিল খুলতে লাগল। দুঃখবাবু হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে বললেন, "করো কী, করো কী! ফাঁক পেলেই পুলিশ ঢুকে পড়বে।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা! দরজা খুলে দুদ্দাড় তিন ভাই-বোনে বেরিয়ে পড়ল। অন্ধকারে বাগান পেরিয়ে তারা সোজা গিয়ে হাজির হল ছোটকাকার ল্যাবরেটরিতে।

হারাধনের ল্যাবরেটরি দেখলে তাক লেগে যায়। সেখানে কী নেই? বাগানের দিক থেকে ঢুকলে প্রথমেই পড়বে বিরাট একটা উদ্ভিদ-ঘর। কাচের শার্শি দেওয়া এই ঘরটায় নানান ধরনের টবে কিম্ভুত সব গাছপালা। তাতে চাগম (চাল+গম), লামড়ো (লাউ-কুমড়ো) ইত্যাদি গাছও আছে। এ ঘর পেরোলে একটা অন্ধকার-মতো ঘর। চামসে গন্ধে সেখানে টেকা দায়। এ-ঘরে অসংখ্য খাঁচায় রাজ্যের পাখি রাখা আছে। পাখিদের মধ্যে কাক, শালিখ, পায়রা থেকে শুরু করে ধনেশ, চিল, শকুনের মতো বিচিত্র সব নমুনা আছে। আর-একটা ঘরে বানর, গিনিপিগ, ব্যাং, খরগোশ, সাদা ইঁদুর। তার পাশের ঘরের নানান ঝাঁপিতে সাপ, বিছে, কীট-পতঙ্গ। এ ছাড়া একটা রসায়নাগার, একটা পদার্থবিদ্যার ঘর আর একটা টেলিস্কোপ-ঘরও আছে।

মনোজ সরোজ পুতুল আলাদা হয়ে তিনজনে তিন ঘরে হারাধনকে খুঁজতে থাকে।

পুতুলই ছোটকাকাকে খুঁজে পেল পাখির ঘরে। সেখানে বৈজ্ঞানিক হারাধন একটা কাকের খাঁচার সামনে বসে একমনে একটা প্যাডে কী লিখছে।

পুতুল হাঁফাতে-হাঁফাতে ছুটে গিয়ে বলে, "ছোটকাকা, পুলিশ! মেজকাকাকে ধরতে এসেছে। কী ভীষণ কাণ্ড দেখবে চলো।"

বৈজ্ঞানিক হারাধন এত চিন্তাকুল যে, প্রথমটায় পুতুলকে চিনতেই পারেনি। অনেকক্ষণ বাদে চিনতে পেরে বলল, "কী বলছিস?"

পুতুল তখন খাঁচাটার মধ্যে রাখা কাকটাকে একমনে দেখছে। কাকটার গলায় এখনও পৈতে জড়ানো, পায়ে একটা ঝুমঝুমির মতো কী যেন বাঁধা। খুবই চেনা কাক।

পুতুল অবাক হয়ে বলল, "আরে! এই কাকটাই তো সকালে আমাদের বাড়িতে কুরুক্ষেত্র করেছে। এটার জন্যই কত সব কাণ্ড হয়ে গেল! তুমি কাকটাকে ধরলে ছোটকাকা?"

হারাধন বিরক্ত হয়ে বলে, "ধরব কেন? এটা তো আমারই কাক। সকালে ছেড়ে দিয়েছিলাম এক্সপেরিমেন্টের জন্য। তারপর বিকেল হতেই আবার নিজে থেকে এসে খাঁচায় ঢুকেছে।"

"তোমার কাক! তোমার কাক এত বদমাশ কেন বলো তো।"

হারাধন একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে বলে, "বদমাশ হবে কেন? একটু তেজী আর কী! অন্য চার-পাঁচটা সাধারণ কাকের মতো নয়। তা সে ওর দোষ নয়, আমিই নানারকম ওষুধ আর ইলেকট্রিক চার্জ দিয়ে দিয়ে এটাকে ওরকম বানিয়েছি। এ আর কী দেখছিস! চারটে যা হনুমান বানিয়েছি না, তারা একেবারে ডাকাত। ছেড়ে দিলে লঙ্কাকাণ্ড করে আসবে।"

পুতুল হারাধনের হাত ধরে টানতে-টানতে বলল, "হনুমানের কথা পরে। আগে চলো। পুলিশের সঙ্গে ঠাকুরঝির মারামারি হচ্ছে যে!"

"বলিস কী!" বলে হারাধন লাফিয়ে ওঠে।

"শুধু তাই বুঝি! পুলিস আবার মেজকাকুকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। যা বিচ্ছিরি কাণ্ড না, আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে।"

হারাধন দুই লাফে ল্যাবরেটরি পার হয়ে উঠোনের দিকে দরজা খুলে দেখে, বাস্তবিক সারা উঠোন জুড়ে তাণ্ডব শুরু হয়েছে। পাঁচিল টপকে-টপকে সব সিপাইরা উঠোনে নামছে আর ঠাকুরঝি প্রকাণ্ড লাঠি নিয়ে তাদের তাড়া করছে। কিন্তু তারা কাবাডি খেলোয়াড়ের মতো ঠাকুরঝির লাঠির নাগাল এড়িয়ে দৌড়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। ঠাকুরঝি চেঁচাচ্ছেন, "ডাকাত! ডাকাত! ওরে তোরা কেন পুলিশকে খবর দিচ্ছিস না?"

ঠিক এই সময়ে অন্ধকারে সতীশ ভরদ্বাজ মশাইও উঠোনে ঢুকে পড়েছেন। তিনি বললেন, "উঁহু, এরা ডাকাত নয়, এরা হল পুলিশ। আপনি বরং ডাকাতদের ডাকুন, নইলে এ পুলিশদের ধরবে কে?"

আদ্যাসুন্দরীর তখন হুঁশ হল। তিনি একটা রোগা পুলিশের ঠ্যাঙে পটাং করে লাঠির ঘা বসিয়ে নতুন করে চেঁচাতে লাগলেন, "ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ, শিগগির ডাকাতদের খবর দাও। আমাদের বাড়িতে পুলিশ পড়েছে।"

তখন চারদিকে আরও কয়েকজন চেঁচাল, "ওরে, শিগগির ডাকাতদের খবর দে, এবাড়িতে পুলিশ ঢুকেছে।"

হারাধন দৃশ্যটা দু মিনিট দাঁড়িয়ে দেখল। তার দুধারে পুতুল, সরোজ, মনোজ। তারপর ধীরে ধীরে ভাইপো-ভাইঝিদের হাত ধরে ঘরে টেনে এনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, "শোন, এখন আমি যে ব্যবস্থা করব তা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলবি না। আমার সন্দেহ হচ্ছে পুলিশের ছদ্মবেশে অন্য কোনও রাষ্ট্রের চর আমার ফরমুলা চুরি করতে এসেছে। এদের শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

বলে হারাধন গটগট করে গিয়ে তার জীবজন্তুর ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সরোজ, মনোজ আর পুতুল। ঘরের একেবারে কোণের দিকে চারটে বিশাল খাঁচা। সেগুলোর চারদিকে চটের পর্দা ফেলা। হারাধন গিয়ে খাঁচার পা তুলে দিল। ভিতরের দৃশ্য দেখে সরোজ মনোজ আর পুতুলের চোখ ছানাবড়া। তারা তাড়াতাড়ি ছোটকাকার গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

খাঁচার ভিতরে চারটে বিশাল চেহারার হনুমান। এত বড় হনুমান যে থাকতে পারে, তা তিন ভাইবোনের জানাই ছিল না। সরোজ প্রথমটায় বলে উঠল, "গোরিলা।"

"বনমানুষ।" পুতুল বলে ওঠে।

মনোজ বলল, "না, হনুমান। তবে বড্ড বড়।"

হারাধন খাঁচার দরজার তালা খুলতে খুলতে বলল, "এ হচ্ছে গোরিমান।"

"তার মানে?" সরোজ জিজ্ঞেস করে।

মনোজ ছোটকাকার ব্যাপার-স্যাপার ভালই জানে, সে তাই বলে উঠল "খানিকটা গোরিলা, খানিকটা হনুমান, না ছোটকাকা?"

"হুঁ। তবে ওষুধ দেওয়া হনুমান, আর পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের কারসাজি। তোরা দৌড়ে গিয়ে বাড়ির লোকজনকে সব ঘরে ঢুকে যেতে বল। আমি হনুমান ছেড়ে দিচ্ছি। তারপর লঙ্কাকাণ্ড কাকে বলে তা সবাই টের পাবে।"

সরোজ, মনোজ আর পুতুল দৌড়ে গিয়ে ঠাকুরঝি, ঠাকুমা, মা, কিরমিরিয়া সবাইকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে লাগল। আর সেই সময়ে আধো অন্ধকারে অতিকায় চারটে বিভীষিকা বিভীষণ-লাফ দিয়ে উঠোনে নেমে এসে পিলে চমকানো ডাক ছাড়ল "গাপ! ধর! গাপ! ধর।"

সে-ডাক শুনলে রক্ত জল হয়ে যায়, সে-চেহারা দেখলে ভিরমি খেতে হয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, তারা এক একটা পুলিশকে নেংটি ইঁদুরের মতো এক-এক হাতে তুলে যখন এ-ধার ও-ধার ছুড়ে ফেলছিল, তখন তাদের এলেম দেখে সবাই তাজ্জব।

প্রথমটায় পুলিশরা ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। একজন আবার একটা হনুমানকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়েও উঠেছিল, "এইবার খুনিকে ধরেছি!" তারপরই সে হঠাৎ তারস্বরে বলতে লাগল, "না না, এর যে লেজ রয়েছে! ও বড়বাবু, খুনির কি লেজ আছে নাকি?"

তারপরই দেখা গেল হনুমানকে জড়িয়ে ধরেছিল যে পুলিশটা, সে শূন্যপথে উড়ে পাঁচিলের ওধারে পড়ল। একজন পুলিশ গিয়ে পড়ল টিনের চালে। হনুমানদের একজন দুটো পুলিসকে দু বগলে নিয়ে মহানন্দে এক চক্কর নাচ নেচে নিল।

সতীশ ভরদ্বাজ ঘর থেকে জানালা দিয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে বললেন, "আদ্যাদিদির ডাকের গুণ আছে। এ যে দেখছি চার-চারটে পালোয়ান ডাকাত! না...না...ডাকাত তো নয়! সর্বনাশ! এ যে স্বয়ং রামচন্দ্রের ভক্ত। ও আদ্যাদিদি, কলিকালে দু পাতা বিজ্ঞান পড়ে ম্লেচ্ছরা ধর্ম মানতে চায় না। কিন্তু নিজের চোখে সবাই এসে দেখুক ভক্তের বিপদের সময় ভগবান তাঁর অনুচর পাঠান কিনা। ওই দেখ সবাই, দু চোখ ভরে চেয়ে দেখ, স্বয়ং রামভক্ত হনুমানেরা এসেছেন!...আহা! কী করাল বিশাল চেহারা! কী সাংঘাতিক গায়ের জোর! ...জয় বাবা হনুমানের জয়!"

বাইরে রামু আর রঘুও বিকট সুরে চেঁচাচ্ছিল, "জয় বজরঙ্গবলী! জয় মহাবীর হনুমানজিকি! জয় রামভগবানকি! জয় জানকী মায়জিকি!"

সেই বিশাল হনুমানের মারমূর্তি দেখে পুলিশরা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দুদ্দাড় দৌড়ে পালাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে সব ফর্সা। খালি উঠোনে হনুমানগুলো লাফাচ্ছে। আদ্যাশক্তিদেবী তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘর থেকে এককাঁদি কলা নিয়ে উঠোনে ছুড়ে দিয়ে বললেন, "খাও, বাবারা খাও।"

হারাধন দরজার আড়াল থেকে সাঙ্কেতিক শিস দিতেই হনুমানগুলো কলার কাঁদি নিয়ে চোখের পলকে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে গেল।

বাইরে নিশি দারোগা, রাখোবাবু, দুঃখবাবু, গণেশবাবু বা পাড়ার লোকজন কেউ কিছু বুঝতে পারলেন না কাণ্ডটা কী! সবাই দেখলেন, সেপাইরা কার যেন তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে। একজন সেপাইও অবশ্য দাঁড়াল না, যাকে ধরে জিজ্ঞেস করা যায় যে ব্যাপারটা কী, সবাই পাঁই পাঁই করে ছুটে পালাল।

নিশি দারোগা দুহাতে রাখোবাবুকে জাপটে ধরে চেঁচাতে লাগলেন, "বাবা রে, বাবা রে! ভূত! ডাকাত! খুনি! রাখোবাবু, রক্ষে করুন।"

দুঃখবাবু তাঁর খিল-আঁটা ঘরের মধ্যে থেকেও ভয়ে পড়ার টেবিলের তলায় ঢুকে গেলেন। গণেশবাবু তানপুরাটা গদার মতো ঘোরাতে ঘোরাতে চেঁচাতে লাগলেন, "আমার কাছে কেউ এলে খুন করে ফেলব বলে দিলাম।"

হনুমানরা চলে গেছে দেখে সতীশ ভরদ্বাজ বেরিয়ে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "এখন ওই ঘোর নাস্তিক হারাধনটাকে ডেকে নিয়ে এসো। দেখে যাক ধর্মের কল বাতাসে নড়ে কিনা! দু পাতা বিজ্ঞান পড়ে সব পণ্ডিত হয়েছে। আমার হাঁদুভুঁদুকে তুচ্ছজ্ঞান করে। একদিন বুঝবে ঠেলা, তখন এসে হাতে-পায়ে ধরে বলতে হবে, ঠাকুরমশাই, ধর্মে বিশ্বাস না করে বড় অন্যায় করেছি।

সেপাইরা সব পালিয়েছে। দারোগাবাবু একা বাড়ি ফিরতে সাহস করছে না। রাখোবাবু রঘুকে ডেকে টর্চ হাতে দিয়ে বললেন, "যা, দারোগাবাবুকে এগিয়ে দিয়ে আয়গে যা।"

বাড়ি আবার ঠাণ্ডা হলে রাখোবাবু সবাইকে ডেকে মিটিং বসালেন। বললেন, "ভজুটার কোনও খোঁজ নেই। বাড়ির মেয়েরা বাদে সবাই লাঠি, টর্চ বা হ্যারিকেন নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। তাকে খুঁজে না আনা পর্যন্ত রহস্যটা পরিষ্কার হবে না। আর এও বোঝা যাচ্ছে না, পুলিশরা হঠাৎ সার্চ থামিয়ে পালাল কেন! সবাই তোমরা বলছ বটে হনুমানে তাড়া করেছিল। কিন্তু তাতে ঘটনাগুলো আরও জট পাকাচ্ছে। প্রশ্ন ওঠে, হনুমানই বা এল কোত্থেকে! হনুমানগুলোকেও খুঁজে দেখ। এ-বাড়িতে তো তাদের উৎপাত ছিল না!"

এই কথা শুনে হারাধন খুব গম্ভীর হয়ে গেল। আর মনোজ, সরোজ, পুতুল নিজেদের মধ্যে গা-টেপাটেপি করতে লাগল।

সতীশ ভরদ্বাজ জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, "ভক্তের ডাকে স্বয়ং ভগবান তাদের পাঠিয়েছিলেন। তাদের আর কোথায় খুঁজবে?"

খোঁজাখুঁজির নামে দুঃখবাবু বলে উঠলেন, "আমার পায়ে বড় ব্যথা।"

গণেশবাবু বললেন, "আমারও। আমি বরং বাড়ি পাহারা দেব।"

রাখোবাবু তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ছাত্রছাত্রীদের সামনে কোনও কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন না। ভজুকে খুঁজে না-পেলে অনেক গোলমাল দেখা দেবে।"

তারপর রাখোবাবু সকলের দিকে চেয়ে বললেন, "আর দেরি নয়। সবাই বেরিয়ে পড়ো। বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য পিসিমা একাই যথেষ্ট। তিনি আজ পুলিশের বিরুদ্ধে যে পৌরুষ দেখিয়েছেন, তা কোনও পুরুষেও দেখাতে পারেনি। কাজেই আমি তাঁর ওপর বাড়ি দেখাশোনার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত। পুরুষরা সবাই ভজুকে খুঁজতে যাবে।"

একথার পর সবাই উঠে পড়ল।

শরবতের গুণে ভজবাবুর ভারী ফুর্তি এসে গেছে। এত ভাল লাগছে তাঁর যে বলার নয়। মাঝে মাঝে গান গেয়ে উঠছেন।

রাত বারোটা বেজে গেল। ভরপেট মাংস আর ভাত খেয়ে ডাকাতরা খানিক গড়াগড়ি দিয়ে উঠে পড়েছে। পুরুতমশাই সকলের কপালে তেল সিঁদুর আর যজ্ঞের কালি লাগিয়ে দিয়েছেন। কানে জবা ফুল গোঁজা।

ভজবাবু মন্দিরের চাতালে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে হাতে খাঁড়া নিয়ে রক্তচোখে সব দেখছিলেন। একটা হাঁক দিয়ে বললেন—সব লাইন করে দাঁড়া।

ডাকাতরা চটপট দাঁড়িয়ে গেল। সুন্দরমতো মেজ-সর্দার ভজবাবুর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে চেয়ে ভজবাবু এক গাল হেসে বললেন, "দেখলে! সবাই কেমন আমাকে মানে!"

"আপনার কথা আলাদা।"

"হে হে" বলে ভজবাবু নিজের হাতের খাঁড়াটা আবার বাঁই বাঁই করে চারদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ডাকাতদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "ভাইসব, আজ বড় আনন্দের দিন। আমি কথা বলতে পারছি না। আজ আমার কথাগুলি সব আনন্দের চোটে গান হয়ে যেতে চাইছে। তা ভালই। আমি গানে গানেই তোমাদের আদেশ করব। তোমরা সেইমতো চলবে। কেমন?"

ডাকাতরা একবাক্যে বলে ওঠে, "সর্দারের যেমন হুকুম।"

ভজবাবু গলাটা একটু সাফ করে নিয়ে গেয়ে উঠলেন, "হে দস্যুবর্গ, হাতে নাও খড়্গ, চলো যাই লুণ্ঠনকর্মে..."।

ডাকাতরা সবাই ঝটপট খাঁড়া, তলোয়ার, লাঠি আর বল্লম যে যা পারল হাতে নিয়ে দাঁড়াল।

ভজবাবু এবার অন্য গান ধরলেন, "চল্ রে চল্, বন্ধুদল, সামনে চল্ সবাই..."

ডাকাতরা চলতে থাকে। সবার সামনে ভজবাবু আর মেজ সর্দার। মেজ সর্দারের হাতে একটা মশাল জ্বলছে।

ভজবাবু খাঁড়া ঘুরিয়ে গাইতে লাগলেন, "বিঘ্ন বন্ধ, খানা ও খন্দ ডিঙিয়ে চল্ সবাই..."

ভজবাবুকে খুঁজতে বেরিয়ে বাড়ির লোকজন শহরের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

সরোজের হাতে একটা হকি স্টিক আর মননজের হাতে একটা ক্রিকেটের স্টাম্প। দুজনে শহরের উত্তর ধারে চলে এসেছিল। জায়গাটা আগাছা আর জঙ্গলে ভরা। রাত নিশুত। এ অঞ্চলে লোকজনের বসবাস খুবই কম। শোনা যায়, এ অঞ্চলের বাসিন্দারা খুব একটা ভাল লোক নয়। দিনের বেলাতেও ভয়ে লোক এদিকে আসে না।

মনোজ হঠাৎ সরোজের হাত টেনে ধরে বলে, "এই দাদা!"

সরোজ থমকে গিয়ে বলে, "কী?"

"গান শুনছিস?"

সরোজ কান পেতে শোনে। ঝিঁঝিঁর ডাক, গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ আর ঘুম ভাঙা পাখির অস্পষ্ট ডাক, মাঝে মাঝে শেয়ালের "হুয়া, হুয়া"। এইসব ভেদ করে অনেক দূর থেকে ক্ষীণ একটা গানের শব্দ আসছে বটে। কে যেন গাইছে, "ভাঙব লোহার কপাট ভাই, আর তো কোনও শঙ্কা নাই..."।

সরোজ বলল, "এ দিকেই আসছে।"

মনোজ খানিকটা গান শুনে বলল, "মেজকাকার গলা।"

"যাঃ!"

“দেখিস। ওই শোন আরও কাছে এসে গেছে। ওই দ্যাখ মশালের আলো! দাদা, লুকিয়ে পড়।”

দুই ভাই তাড়াতাড়ি গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে পড়ে চেয়ে রইল। তারপর যা দেখতে পেল তা প্রত্যয় হয় না। তারা দেখল, ভজবাবু গান গাইতে গাইতে বিশাল এক দল ডাকাত নিয়ে চলেছেন।

দলটা দুই ভাইয়ের একেবারে নাকের ডগা দিয়েই যাচ্ছিল।

সরোজ বলে, “মেজকাকার হাতে খাঁড়া।”

মনোজ বলে, “মেজকাকার চোখ চকচক করছে।”

সরোজ বলে, “মেজকাকার হল কী?”

মনোজ হঠাৎ মেজকাকার পাশে মশাল হাতে মেজ সর্দারকে দেখতে পেল। একটু চমকে উঠল সে। কিন্তু শব্দ করল না।

ডাকাতের দল তাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। ভজবাবু তখন গাইছেন, “বুকের ভিতরে ঘোড়া ছুটে যায়, ওরে তোরা ছেড়ে দে ছেড়ে দে আজ আমারে...”

সরোজ একটু ভেবে চিন্তে বলে, “মনে হচ্ছে, ডাকাতরা মেজকাকাকে কোথাও ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তাই ছেড়ে দেওয়ার জন্য গান গাইছে মেজকাকা।”

মনোজ মাথা নেড়ে বলে, “মেজকাকাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে না, মেজকাকাই ডাকাতদের নিয়ে যাচ্ছে।”

সরোজ বলে, “কিন্তু মেজকাকার যে দারুণ চোর-ডাকাত আর ভূতের ভয়!”

একটু দূর থেকে ভজবাবুর গলার গান ভেসে আসছিল, “সামনে রাজার বাড়ি, চ্‌ল যাই তাড়াতাড়ি, বিবাদ-বিসম্বাদ থামা রে...”

মনোজ সরোজের হাত চেপে ধরে বলল, “দাদা, ডাকাতদের নিয়ে মেজকাকা রাজবাড়ির দিকে যাচ্ছে। এক্ষুনি ছোটকাকাকে খবরটা দেওয়া দরকার।”

সরোজ বিরক্ত হয়ে বলে, “অত ঝামেলায় কী হবে? চ্‌ল তার চেয়ে মেজকাকাকেই গিয়ে ধরলেই তো হয়। বলব, শিগগির বাড়ি চলো, বাবা ডাকছে। বাবা ডাকছে শুনলেই সুড়সুড় করে চলে আসবে।”

মনোজ মাথা নেড়ে বলে, “দূর, তুই মেজকাকাকে ভাল করে দেখিসনি। দেখলি না, মেজকাকার চোখ কেমন চকচকে, মুখটা ফোলা ফোলা, হাতে খাঁড়া, গলায় গান! এ সেই মেজকাকাই নয়, দেখলে আমাদের চিনবেই না। আর ডাকাতরাই বা ছাড়বে কেন? চল, বাড়ি গিয়ে ছোটকাকাকে ডেকে আনি।”

দুই ভাই বাড়ির দিকে দৌড়তে থাকে।

বাড়ির ফটকেই ঠাকুরঝি। তাঁর সাদা থান তিনি মালকোঁচা মেরে পরেছেন, হাতে টর্চ, লাঠি, আর কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা হাত দা। ঠাকুরমা উঠোনের দরজায় চুপটি করে বসে চোখের জল মুছছেন। মা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে।

সরোজ আর মনোজ ফটকের দিকে গেল না। ছোটকাকা হারাধন বলেছিল, ভাল করে তৈরি হয়ে বেরোতে তার কিছু দেরি হবে। দুই ভাই তাই গিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢোকে।

ঢুকতেই দেখে, হারাধন তৈরি হয়ে বেরোচ্ছে। একটা গোরিমানকে শিকলে বেঁধে নিয়েছে হারাধন, অন্য হাতে একটা টস্তল (টর্চ+পিস্তল, এটা হারাধনের নিজের আবিষ্কার, একই সঙ্গে টর্চ এবং পিস্তলের কাজ করে), আর তার কাঁধে সেই বদমাশ কাকটা বসে আছে। পাখির ঘরে পাখিগুলো খুব চেঁচাচ্ছে।

মনোজ হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, "ছোটকাকা, মেজকাকা ডাকাতের দল নিয়ে রাজবাড়ি লুট করতে যাচ্ছে। শিগগির চলো।"

হারাধন আকাশ থেকে পড়ে বলে, "মেজদা! ডাকাতের দল নিয়ে! রাজবাড়ি! আর কী বললি?"

সরোজ: "লুট করতে..."

মনোজ: "যাচ্ছে..."

হারাধন চোখ বুজে দাঁড়িয়ে বলল, "আবার বল। এবার একটু আস্তে আস্তে।"

সরোজ আর মনোজ পালা করে বলল। পাখির ঘরে পাখিরা খুব চেঁচাচ্ছে এখনও। হারাধন পিছনে ফিরে ঘরটা দেখে নিয়ে বলল, "পাখিগুলোর আজ হল কী? যাকগে। হ্যাঁ, রাজবাড়ি! রাজবাড়িই বললি তো!"

সরোজ আর মনোজ পালা করে বলল। পাখির ঘরে পাখিরা খুব চেঁচাচ্ছে এখনো। হারাধন পিছনে ফিরে ঘরটা দেখে নিয়ে বলল, "পাখিগুলোর আজ হল কী? যাকগে। হ্যাঁ, রাজবাড়ি! রাজবাড়িই বললি তো"!

সরোজ আর মনোজ একসঙ্গে—"হ্যাঁ হ্যাঁ, রাজবাড়ি।"

"মেজদা?"

সরোজ আর মনোজ—"মেজকাকা। গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে।"

"রাজবাড়ি!" বলে হারাধন তবু ইতস্তত করে।

ঠিক এ সময়ে হারাধনের পিছন থেকে কে যেন বিরক্তির গলায় বলে ওঠে, "হ্যাঁ মশাই, রাজবাড়ি। রাজার বাড়ি, যাকে বলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস। জলের মতো সোজা।"

সবাই অবাক হয়ে দেখে, শালিখের খাঁচার পিছন থেকে দুঃখবাবু বেরিয়ে আসছেন।

হারাধন বলে, "আপনি এখানে?"

দুঃখবাবু দুঃখের সঙ্গে বলেন, "আর কোথায় লুকোব বলুন, কিন্তু এই বদমাশ পাখিগুলোই কি লুকিয়ে থাকতে দেয়! তখন থেকে চেঁচাচ্ছে।"

"লুকিয়ে ছিলেন কেন?"

দুঃখবাবু রেগে গিয়ে বলেন, "লুকোব না? একে তো খুনি, তার ওপর পুলিশ, তিন নম্বর হনুমান, চার নম্বর এই রাতে ভজবাবুকে খুঁজতে যাওয়া। চাকরি করতে এসে তো আর প্রাণটা দিতে পারি না মশাই।"

হারাধন বলল, "কিন্তু পাখিগুলো এখনও চেঁচাচ্ছে কেন?"

"গণেশবাবুও আছেন যে!"

বলতে না বলতে টিয়ার খাঁচার পেছন থেকে গণেশবাবু বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন, "গান গাইলেই হল না কি না! সবাই যদি গান গাইতে পারত তবেই হয়েছিল আর কি!"

হারাধন অবাক হয়ে বলে, "হঠাৎ গানের কথা কেন?"

গণেশবাবু বললেন, "ওই তো শুনলেন সরোজ আর মনোজের মুখে, ভজবাবু নাকি গান গাইতে গাইতে ডাকাতি করতে যাচ্ছেন। ডাকাতি করা খারাপ কাজ বটে, কিন্তু যে গানের গ জানে না তার গান গাওয়া ডাকাতির চেয়েও খারাপ কাজ।"

হারাধন বলে, "তা বটে, কিন্তু মেজদা তো কখনও ভুলেও গান গায় না।"

গণেশবাবু গায়ের ধুলো-টুলো ঝেড়ে বললেন, "আপনার এই চিড়িয়াখানাটা বড় জব্বর জায়গা মশাই। যে ঘরেই লুকোতে যাই সে ঘরেই ডিসটার্বেন্স। এ ঘরে গেলে হনুমান দাঁত খিঁচোয়, ও ঘরে সাপ ফোঁস ফোঁস করে, সে ঘরে ব্যাং ডাকে, এ ঘরটায় পাখিদের কী কিচির মিচির বাবা! এর চেয়ে ভজবাবুর গান শোনা ভাল। চলো দেখি সরোজ মনোজ, তোমাদের মেজকাকু কেমন গাইছে সেটা শুনে আসি।"

দুঃখবাবু মনের দুঃখে বলে, "সবাই গেলে আমিই বা একা থাকি কী করে? এ বাড়ি খুব সেফ নয়। চলুন আমিও না হয় একটু ঘুরে আসি।"

রাত্রিবেলা রাজা গোবিন্দনারায়ণের ভাল ঘুম হয় না। তার কারণ হল, শোওয়ার আগে তিনি কোমরে একটা মোটা ঘুনসিতে রাজবাড়িতে যত চাবি আছে সব বেঁধে নিয়ে তবে ঘুমোতে যান। রাজবাড়ির চাবির সংখ্যা কম নয়। দেউড়ির চাবি থেকে শুরু করে ভাঁড়ারের চাবি মিলিয়ে ছোট বড় শত খানেক তো হবেই। কোমরের চারধারে গোল, মোটা, লম্বা, ছোট বড় হরেক চাবি ঝুলিয়ে রাজা যখন শোন তখন সেগুলো গায়ে ফোটে। তার ওপর একটু নড়লে চড়লেই চাবিগুলোর ঝনঝন করে বিকট শব্দ হয়।

গোবিন্দনারায়ণের আজ রাতে ঘুম না হওয়ার একটা তৃতীয় কারণও আছে। গোয়েন্দা বরদাচরণের কাছ থেকে তিনি আজই জানতে পেরেছেন যে, চোরকুঠুরির জমানো টাকাগুলো সবই অচল। তাঁর অবশ্য বিশ্বাস হয়নি। তাই সন্ধের পর তিনি চোরকুঠুরি থেকে দুটো টাকা বের করে চাকরকে বাজারে পাঠিয়েছিলেন মুড়ি কিনে আনতে। চাকর এসে টাকা দুটো ফেরত দিয়ে বলেছে, "দোকানদার জিজ্ঞেস করল এ নোট দুটোয় কি উটের ছবি ছাপা আছে?"

গোবিন্দনারায়ণ তখন থেকে শোকমগ্ন। তার ওপর হাড় হাভাতে গোয়েন্দাটা মহা জ্বালাতন শুরু করেছে তখন থেকে। কেবল বলছে, "আপনি আমার মাস মাইনেটা কি ওইসব টাকা দিয়ে দেবেন নাকি? আপনার মতলব তো ভাল ঠেকছে না।

গোবিন্দনারায়ণ তাকে যতই ধমকান সে কিছুতেই শোনে না। কেবল বলে, "ও হোঃ হোঃ, আমি যে অনেক আশা করে কেসটা হাতে নিয়েছিলাম!"

তর্কে বিতর্কে রাত হয়ে যাওয়ায় বরদাচরণ আর বাড়ি ফেরেননি, তিনি রাজা গোবিন্দনারায়ণকে বলেছেন, "সকাল হলে আমি রাজবাড়ির রূপোর বাসন নিয়ে গিয়ে বাজারে বেচে দেব।" এই বলে গোয়েন্দাটা রাজার হেঁসেলে রাতের খাওয়া সেরে বাইরের দরবার ঘরে ঘুমোত গেছে।

সেই থেকে গোবিন্দনারায়ণের ঘুম নেই। চোর কুঠুরির সব টাকা অচল। গোয়েন্দা সকালবেলা রুপোর বাসন নিয়ে যাবে। ভাগ্নেটা গাওয়া ঘিয়ের লুচি খেয়ে গেল।

রাত বারোটার পর গোবিন্দনারায়ণ আর বিছানায় থাকতে পারলেন না। এই শীতেও বিছানাটা গরম ঠেকছে। উঠে চাবির শব্দ তুলে একটু পায়চারি করছিলেন। সে সময়ে শুনতে পেলেন কে যেন দেউড়ির কাছে গান গাইছে, "দরজা খোলো হে, ঝটপট খোলো, দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা..."

গান গোবিন্দনারায়ণের খারাপ লাগে না। তিনি তাই ভাল করে শোনার জন্য দোতলার অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন। আর দাঁড়িয়েই মূর্ছিত হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

ভজবাবু উঁচু গায় গাইলেন, "দরজা যদি না খোললা তবে আজ টেনে তুলে নেব চামড়া..."

রাজবাড়ির দুচারজন বুড়ো দারোয়ান এখনও অবশিষ্ট আছে। তারা সব ঘুমোচ্ছিল, গান শুনে উঠে সবাই বাইরে এসে ফটকের বাইরের দৃশ্য দেখে হাঁ।

মেজ সর্দার বাইরে থেকে গর্জন করে ওঠে, "এই! সব হাঁ করে দেখছিস কী? ফটক খুলে দে!"

একজন বুড়ো দারোয়ান চাবির জন্য রাজার কাছে দৌড়ে এল। রাজা মূর্ছা ভেঙে বললেন, "দুর্গা দুর্গতিনাশিনী! গোয়েন্দাটা বসে বসে মাইনে খায়, ওটাকে ঘুম থেকে তুলে দে তো! আর দৌড়ে পিছনের ফটক দিয়ে গিয়ে পুলিশে খবর দে।"

দারোয়ান চলে গেল।

বাইরে ভজবাবু গেয়ে উঠলেন, "লাথি মেরে ভাঙব তালা, দারোয়ান দৌড়ে পালা, বাঁচতে যদি চাস..."

মুহূর্তের মধ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশটা মশাল জ্বলে উঠল। সেই সঙ্গে রাজবাড়ির পুরনো মরচে পড়া ফটকে দমাদম লাথি পড়তে থাকে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ফটক ভেঙে ডাকাতরা রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে থাকে।

দারোগাবাবু রাতে কিছু খাননি। দু চুমুক দুধ বার্লি খেয়ে শুয়ে মা কালীর নাম করছিলেন। একটা সেপাই তার গা হাত পা টিপে দিচ্ছিল।

সদ্য ঘুমটা এসেছে এমন সময় থানা থেকে লোক এসে খবর দিল, "রাজবাড়িতে ডাকাত পড়েছে। যেতে হবে।"

শুনে দারোগাবাবু দুঃস্বপ্ন মনে করে এক পাশ থেকে আর এক পাশ ফিরে শুলেন।

কিন্তু থানার লোকটা ছাড়ে না। কেবল ডাকাডাকি করে, "বড়বাবু, উঠুন, রাজবাড়িতে ডাকাত পড়েছে।"

ঘুম-চোখে দারোগাবাবু বললেন, "রাজবাড়ির ডাকাত তো। আমাদের বাড়ির তো নয়! আমাদের কী তাতে?"

"সব লুঠ হয়ে গেল বড়বাবু!"

দারোগাবাবু ফের পাশ ফিরে বললেন, "লুঠ করে যাবে কোথায়? কাল সকলেই সব কটাকে ধরে ফেলব।"

"খুন-খারাবি হবে যে!"

"খুন করতে বারণ করে দে। একটু ভয় দেখিয়ে দিবি। বলবি খুন করলে ফাঁসি হবে। লুঠ করলে জেল।"

লোকটা কাকুতিমিনতি করতে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে ঘুমের ঘোর ভেঙে দারোগাবাবু বলেন, "ওঃ বাবা! এক দিনে আর কত হবে। মার্ডারার, হনুমান, ডাকাত! ব্যাটারা পেয়েছে কী আমাকে! আমি কি ওদের চাকর যে যা খুশি করবে আর আমাকে দৌড়ে বেড়াতে হবে!"

কিন্তু কর্তব্যবশে দারোগাবাবুকে উঠতেই হল। পোশাক পরে মা কালীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললেন, "মা গো। আমি যাওয়ার আগেই যেন ডাকাতি করে ডাকাতরা সরে পড়ে। ধর পাকড়ের অনেক হাঙ্গামা মা।"

বরদাচণের ঘুম কুকুরের ঘুমের মতো পাতলা। গোয়েন্দাদের এটাই গুণ। ফটক ভাঙার শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছেন তিনি। রাজবাড়ি থেকে তাঁকে শোওয়ার জন্য একটা মোটা কুটকুটে কম্বল দিয়েছে, তাই সারা গা চুলকোচ্ছিল।

বরদাচরণ গা চুলকোতে চুলকোতে বেরিয়ে এসেই ভজবাবুর একেবারে মুখখামুখি পড়ে গেলেন। দেখলেন, ভজবাবুর হাতে খাঁড়া, কপালে তেল সিঁদুরের ছাপ, কানে জবাফুল, কণ্ঠে গান। ভজবাবু খাঁড়াটা ঘোরাতে ঘোরাতে গেয়ে ওঠেন, "ছুঁসনে আমাকে, দূরে দূরে থাক্, নইলে মাথাটা করব দুফাঁক, ওরে গোয়েন্দা পাজি..."

কিন্তু ভজবাবুকে ছোঁওয়ার ইচ্ছে বরদাচরণের একটুও নেই। ছুঁয়ে হবেটা কী? এত রাতে কারই বা চোর-পুলিশ খেলতে ইচ্ছে যায়? তিনি বললেন, "ভজবাবু, এত রাতে কী ব্যাপার?"

পিছন থেকে ডাকাতরা রে-রে করে ওঠে।

বরদাচরণ পিস্তলের জন্য খাপে হাত দিলেন। পিস্তল নেই। আর পিস্তলহীন গোয়েন্দা যে কত অসহায় তা বুঝতে পেরে রদাচরণ পিছু ফিরে দৌড় লাগালেন।

কিন্তু পারবেন কেন? দৌড়ে হয়তো পারতেন, কিন্তু প্রথমেই সিংহাসনে হোঁচট খেয়ে মেঝেয় পড়লেন। উঠে ছুটতে গিয়ে ফের দেওয়ালে ধাক্কা লাগল।

ভজবাবু এসে দাঁড়িয়ে গাইতে থাকেন, "বলো আজ তুমি কোথায় পালাবে, যেখানেই যাও সেখানেই যাবে দস্যুরা তোর পিছনে..."

"হচ্ছে না! সুর হচ্ছে না।" অন্ধকারে কে যেন চেঁচিয়ে বলে ওঠে।

ভজবাবু রেগে গিয়ে বলেন, "কে বলে সুর হচ্ছে না?"

"আমি বলছি," বলে ডাকাতদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে গণেশবাবু ঘরে ঢুকে বলেন, "গানটা ইয়ার্কি নয় ভজবাবু! শিখতে হয়। ওটা কীরকম গান হল শুনি! সর্বেশ্বর কারফর্মার 'দস্যু' নৃত্যনাট্য আমি নিজে ডিরেকশন দিয়েছি কতবার। শুনবেন? তাহলে শুনুন!" বলে গণেশবাবু হাত নেড়ে নেড়ে গাইলেন, "বলল আ...আজ তু...উমি কোথায় পা...আলাবে..."

ভজবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "কাজের সময় এখন দিক করবেন না তো গণেশবাবু! আমি এখন ডাকাতদের ডিরেকশন দিচ্ছি..."

"এঃ, ডিরেকশন যত খুশি দিন, তা বলে গানের অপমান আমি সহ্য করব না।"

এ নিয়ে একটা ঝগড়া বেধে উঠল বেশ।

মেজ সর্দার বা অন্য ডাকাতরা এসব ঝগড়া কাজিয়া দেখে ভ্রুক্ষেপ করল না। তারা কাজ হাসিল করতে এসেছে। ঝগড়া কাজিয়া নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে কেন?

মেজ সর্দার গিয়ে সোজা গোবিন্দনারায়ণের গলায় খাঁড়া ধরে বলল, "চাবিগুলো দিয়ে দিন রাজামশাই।"

রাজা গোবিন্দনারায়ণ বললেন, "তাতিরাতাচি গামা হণ্ডুরাস।"

মেজ-সর্দার অবাক হয়ে বলে, "তার মানে?"

রাজামশাই আবার বলেন, "গিমি গড়গড়ি কেরোসিন বোম।"

মেজ-সর্দার হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, "ওরে তোরা শোন তো এসে, রাজামশাই কী ভাষায় কথা বলছে।"

রাজামশাই নিজেও তা বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল বোধহয় দৈবক্রমে তিনি স্বপ্নাদ্য কোনও নতুন ভাষা শিখে ফেলেছেন। অর্থ না-বুঝলেও তাঁর মুখ দিয়ে অনবরত ওই সব কিম্ভুত কথা বেরিয়ে যাচ্ছে। এবার তিনি বললেন, "গমেসি গদাধর ভাগভাগ ফুংকাসুন।"

কানাই খুব মন দিয়ে শুনে বলে, "নাঃ, বোঝা যাচ্ছে না। তেলুগু হতে পারে।"

বিড়ি-চোর বলে, "তেলু টেলু নয়। আমি বোর পাহাড়ে গিয়ে ঠিক এই ভাষা শুনে এসেছিলাম। তবে মানে বলতে পারব না।"

একটা অল্পবয়সী ডাকাত বলল, "রাজাদের ব্যাপারই আলাদা। তারা কি আর আমাদের ভাষায় কথা বলে নাকি? আর কথায় কাজই বা কী?"

মেজ সর্দারও বলে, "ঠিক বলেছিস। এত কথায় কাজ কী? কানাই, রাজামশাইয়ের কোমরের ঘুনসি থেকে চাবির গোছাটা খুলে দে তো।"

কানাই চাবির গোছা খুলে নিল।

রাজামশাই শুধু বললেন, "সামসাদিঘি টক দৈ হামলা খামলা।" বলতে বলতে রাজামশাই তখনও অবাক হয়ে ভাবছেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে এসব কথা বেরোচ্ছে কী করে। মনে-মনে তিনি যা ভাবছেন তা বুঝতে তাঁর অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু যেই সেকথা বলতে চাইছেন অমনি তাঁর জিভ যেন বদমাইশি করে কথাগুলোকে অন্য একটা বিদঘুটে ভাষায় ট্রানসলেট করে দিচ্ছে। যেমন তিনি এখন বলতে চাইছিলেন 'বাবারা, হামলা কোরোনা, যা চাও নিয়ে যাও।' এর মধ্যে কোত্থেকে সামসাদিঘি বা টক দৈ আসে তা বোধের অগম্য।

ডাকাতরা চাবি খুলে নিয়ে রাজামশাইকে একা রেখে চলে গেল। রাজামশাই দাঁড়ানো অবস্থাতেই মূৰ্ছিত হয়ে রইলেন। এটা অবশ্য তাঁর পুরনো অভ্যাস, দাঁড়িয়ে মূৰ্ছা যেতে তাঁর কোনও অসুবিধেই হয় না।

অন্দরমহলের একটা বড়-সড় ঘরে রাজমাতা আর রানী-মা দুটো পাশাপাশি খাটে শোন। মাঝখানে মেঝেয় শোয় রাজবাড়ির পুরনো দাসী।

রাজমাতার ভাল ঘুম হয় না। মাথায় রাজ্যের চিন্তা। সারাদিন ঘুঁটে দেন, সেই ঘুঁটে শুকিয়ে পাহাড়প্রমাণ জমিয়ে রাখেন রাজমাতা ঘুঁটে বিক্রি করলে নিন্দে হবে, সেইজন্য নিজে না বিক্রি করে বুড়ি দাসীকে দিয়ে বিক্রি করেন। তাতে বেশ দু পয়সা আয় হয় তাঁর। কিন্তু তিনি যতই গোপন করুন রাজ্যিসুদ্ধু সবাই জানে যে, রাজমাতার ঘুঁটের ব্যবসা আছে। ঘুঁটে অবশ্য তিনি ভালই দেন, সেজন্য লোকে তাঁর প্রশংসাও করে। রাজমাতার দুশ্চিন্তা হল সেই ঘুঁটে নিয়েই। কখন কোন ফাঁকে চোর এসে ঘুঁটে চুরি করে নিয়ে যায়, তা ভেবে রাতে তাঁর ঘুম হয় না। এ রকম কয়েকবারই চুরি গেছে। কতবার ছেলে গোবিন্দনারায়ণকে বলেছেন, "আমাকে একটা নেড়ী কুকুর এনে দে, পুষি। সে আমার ঘুঁটে পাহারা দেবে।" কিন্তু তাঁর রাজা-ছেলে সে-কথা কানে নেয়নি।

রাজমাতার আরও দুশ্চিন্তা একমাত্র নাতিটার কথা ভেবে। সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে রইল!

এইসব ভেবে তাঁর ঘুম আসে না। রাতবিরেতে জেগে বসে মাথা চুলকোন। বড্ড উকুন হয়েছে। আজও চুলকোচ্ছিলেন। হঠাৎ হট্টগোল শুনে উঠে বসে ছেলের বউকে ডাকতে লাগলেন, "অ বউমা, ওঠো তো! ও কারা গণ্ডগোল করছে?"

রানীমা-রও ঘুম নেই। এক কথা, ছেলে নিরুদ্দেশ। তা ছাড়া কিপটে রাজার ঘর করেন বলে তাঁকে সব সময় সংসারের নানা দুশ্চিন্তা করতে হয়। ঘুম তাঁরও হয় না। শাশুড়ির গলা শুনে বললেন, "শুনছি মা। মনে হচ্ছে ডাকাত-টাকাত পড়েছে।"

"হায় ভগবান! ডাকাতই যদি পড়েছে তবে শুয়ে আছ কেন? ওঠো দেখি কী হল!"

রানী-মা নিশ্চিন্ত গলায় বললেন, "উঠে হবেই বা কী! ডাকাতরা ঘুরে ফিরে নেওয়ার মতো জিনিস না-দেখে নিজেরাই লজ্জা পেয়ে ফিরে যাবে।"

রাজমাতা মশারি তুলে বেরিয়ে আসতে-আসতে বললেন, "নেওয়ার জিনিস নেই মানে? এখনও আমার তিন হাজার চারশ পঞ্চান্নখানা ঘুঁটে জমা আছে, তা জানো?"

"ডাকাতরা ঘুঁটে নিতে আসে না মা।"

"চোর-কুঠুরিতে আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা আছে তা জানো?"

"সব অচল।"

রাজমাতা বিরক্ত হয়ে বললেন, "আহা, না হয় নাই নিল কিছু কিন্তু আমার গোবিন্দকে যদি মারধোর করে? চলো দেখি গিয়ে।"

রানী-মা উঠে পড়লেন। ডাকাতরা যে মারধোর করতে পারে এটা তাঁর আগে খেয়াল হয়নি।

এদিকে দরবার-ঘরে গোয়েন্দা বরদাচরণের অবস্থা খুবই করুণ। মনোজদের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেওয়াল থেকে পড়ে মাজায় ব্যথা পেয়েছিলেন, এখন সেই ব্যথার ওপর আবার সিংহাসনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আরও অচল হয়ে পড়েছেন। যাকে বলে চলচ্ছক্তিহীন। তা ছাড়া, পালাতে গেলে প্রাণ যাবে বলে ভজবাবু শাসিয়ে রেখেছেন। সে-কথাটা অবিশ্বাসই বা করেন কী করে? ভজবাবুর হাতে খাঁড়া, ভাবসাবও ভাল নয়।

বরদাচরণ মেঝেয় পড়ে ব্যথায় কোঁকাচ্ছেন আর তাঁর দু পাশে দাঁড়িয়ে ভজবাবু আর গণেশ ঘোষাল প্রচণ্ড ঝগড়া করছেন। ঝগড়া করতে-করতে উত্তেজিত ভজবাবু মাঝে মাঝেই খাঁড়া বাঁইবাঁই করে ঘোরাতে থাকেন। তাতে বরদাচরণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, "দোহাই ভজবাবু! খাঁড়া সামলে। নাকে মুখে লেগে যাবে যে!"

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ভজবাবু বুক চিতিয়ে বলছেন, "এঃ! বলে সারে-গামা জানি না। আপনি জানেন? করুন দেখি সারেগামা।"

গণেশ ঘোষালও বুক চিতিয়ে বলেন, "সারেগামা আমাকে করতে বলছেন, ভাল কথা। কিন্তু করলে বুঝবেন কি? গানের "গ"ও তো জানেন না। অথচ আজ প্রকাশ্যে সুরের অপমান করে সারা শহর ঢি ঢি ফেলে দিয়েছেন।"

রাগে ভজহরিবাবু বাঁইবাঁই করে আরও কয়েকবার খাঁড়া ঘোড়ালেন। আতঙ্কে চিঁ চিঁ করে বরদাচরণ বলতে থাকেন, "খাঁড়া সামলে, ভজবাবু! আর-একটু হলে—"

গণেশ ঘোষাল একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন, "হ্যাঁ, ওই খাঁড়া ঘোরানো, পিস্তল দিয়ে ভয় দেখানো, এ-সবই আপনাকে তবু মানায়। কিন্তু গান নয়। শুনুন" এই বলে গণেশবাবু খুব আবেগ দিয়ে বাঁ হাতে নিজের বাঁ কান চেপে ধরে ডান হাতটা ভজবাবুর মুখের সামনে একটু খেলিয়ে তান ধরলেন, "সা...রে....গা....মা, কোন স্কেলে ধরেছি বলুন তো!"

ভজবাবু একটু থমকে গিয়ে বলেন, “স্কেল? গানের মধ্যে আবার স্কেল কী মশাই? এ কি হাতের লেখা নাকি যে রুল টানতে স্কেল চাই! নাকি গলার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মেপে দেখবেন!”

“হাঃ হাঃ! বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো। স্কেল কাকে বলে তা-ই যখন জানেন না, তখন আর গেয়ে হবেটা কী? তবু গানের মধ্যে যে সম্মোহনী শক্তি আছে তাতে আপনার মতো অ-সুর লোকেরও হয়তো উপকার হতে পারে। তাই শোনাচ্ছি! শুনুন, সা...রে...গা...মা...”

ডাকাতদলের প্রচণ্ড চেঁচামেচি, গণেশবাবুর গলা সাধা, বরদাচরণের ক্ষীণ আর্তনাদ মিলেমিশে সে এক বিটকেল কাণ্ড।

মেজ-সর্দার তার কয়েকজন স্যাঙাত নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়িয়ে সর্দার তার মশালটা তুলে দেয়ালে একটা মস্ত তৈলচিত্র দেখে কানাইকে বলল, “ওটা কার জানিস?”

কানাই বলে, “কার?”

মেজ-সর্দার শ্বাস ফেলে বলে, “আমিও জানি না। তবে খুব চেনা-চেনা ঠেকছে। এ পুরো বাড়িটাই আমার খুব চেনা লাগছে।”

কানাই উৎসাহ পেয়ে বলে, “তবে চোর-কুঠুরিটা কোথায় তা খুঁজে বের করে ফেল।”

মেজ-সর্দার ধমক ছেড়ে বলে, “চোপ! চোর-কুঠুরি চোর-কুঠুরি করে গলা শুকাবি না। আগে আমাকে সব দেখতে দে।”

কানাই ভয় খেয়ে চুপ করে যায়।

অন্য সব ডাকাতরা যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত। একটা লোভী ডাকাত রান্নাঘরে ঢুকে জলে ভেজানো ভাত খেতে ব্যস্ত। একজন বাসনকোসন বস্তায় ভরছে। আর-একজন রাজবাড়ির যত জামাকাপড় সরাচ্ছে। চারদিকেই খুব হাল্লা-চিল্লা।

বিড়ি-চোর বলল, “মেজ- সর্দারের ডাকাতির দিকে মন নেই।”

কানাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “বড়-সর্দারও তাই বলে।”

“কী বলে?”

“বলে, মেজটা ভদ্রঘরে জন্মেছিল। তারপর আট-দশ বছর বয়সে বাড়ি থেকে ভেগে পড়ে। হরিণগড় রেলস্টেশনে গাড়িতে উঠতে গিয়ে পড়ে মাথা ফেটে যায়। সেই থেকে হারানো কথা মনে করতে পারে না। তবে সেই গাড়িতে বড় সর্দার কাশী যাচ্ছিল তীর্থ করতে। মেজ-সর্দার কোন্ বাড়ির ছেলে তা সে বুঝতে পেরেছিল। সে-ই টেনে ট্রেনের মধ্যে ছেলেটাকে তুলে নেয়। মাথায় মতলব ছিল যে, ছেলেটাকে লুকিয়ে রেখে তার বাপের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করবে। কিন্তু সে আর হয়নি। বড় সর্দারের বউয়ের ছেলেপুলে ছিল না, সে ছেলেটাকে নিজের ছেলের মতো করে বুকে আগলে রাখল। পাছে ছেলেটাকে তার মা-বাবা কোনওদিন চিনতে পেয়ে দাবি করে বসে সেই জন্য পরে বউয়ের আবদারে তীর্থ থেকে ফিরে এসে ছেলেটার বাড়ি থেকে তার সব ছবি চুরি করে নিয়ে যায়। ওদিকে বড়-সর্দারের মতি ফেরানোর জন্য তার বউ তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়াত খুব। সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটাকেও রাখত। তা বড়-সর্দারের মতিগতি ভালর দিকেই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু বছর দুই আগে যেই বউ মরল অমনি আবার পুরনো পোকা মাথায় কিলবিল করে উঠল। সর্দার আমাকে

গোপনে বলেছে, ছেলেটার বাবার অবস্থা এখন পড়তির দিকে। টাকা চেয়েও লাভ হবে না। তার চেয়ে ছেলেটাকে ডাকাতির তালিম দিয়ে ছেড়ে দিলে বুড়ো বয়সে দুটো পয়সার মুখ দেখা যাবে।"

বিড়ি-চোর বড়-বড় চোখ করে গল্প শুনছিল। একটা ঢোক গিলে বলে, "তাহলে মেজ-সর্দার কোন্ বাড়ির ছেলে?"

"সে কথা সর্দার প্রাণ গেলেও বলবে না।"

"আমার তো সন্দেহ হয়—"

"আমারও হয়। কিন্তু কথা চেপে রাখ। নইলে গোলমালে পড়বি।"

মেজ-সর্দার রাজবাড়ির দেওয়ালে-দেওয়ালে অয়েল পেইন্টিং দেখে দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পিছনে ডাকাতের দল, কিন্তু তারা সর্দারের ভাব-সাব দেখে কিছু বুঝতে পারছে না। ছবি দেখবে তো পটের দোকানে গিয়ে যত খুশি দেখো, না হয় একজিবিশনে যাও, ডাকাতি করতে এসে ছবি দেখার কথা তারা জন্মে শোনেনি।

একসময়ে ছবি দেখা শেষ করে মেজ-সর্দার গম্ভীর ভাবে বলে, "হুঁ।"

কানাই গলা বাড়িয়ে বলে, "কিছু বুঝলে সর্দার?"

মেজ-সর্দার গম্ভীর মুখে বলে, "চোর-কুঠুরি কোথায় তা এবার জলের মতো বুঝতে পারছি। এই পূব দিকের দেয়ালে এ-বংশের তৃতীয় রাজা হেরম্বনারায়ণের ছবি। এ ছবিতে হেরম্বনারায়ণের বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা যেদিকে বেঁকে আছে সেটা হল চোর-কুঠুরিতে যাওয়ার প্রথম পথ। পথটা অন্দরমহলে গেছে। সেখানে গোঁসাঘরের বাইরের দেওয়ালে পঞ্চম রাজা ভীমনারায়ণের ছবি আছে, তাঁর ডান হাতের তর্জনী চোর-কুঠুরিতে যাওয়ার দ্বিতীয় পথটা চিনিয়ে দেবে। সে পথ ধরে গেলে একটা মস্ত শোবার ঘর পাওয়া যাবে। সেখানে দেওয়ালে নবম রাজা পবননারায়ণের ছবিটা ভাল করে দেখলে দেখা যাবে যে, তিনি মেঝের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে কী যেন খুঁজছেন। অর্থাৎ আমাদেরও মেঝেতেই খুঁজতে হবে। মেঝেটা ভাল করে খুঁজলে কয়েকটা সূক্ষ্ম চিহ্ন দেখা যাবে। সেগুলো অনেকটা তীরের ফলার মতো। সেই চিহ্ন ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলে খাটের তলায় এক জায়গায় গুপ্ত দরজা দেখা যাবে।"

সবাই অবাক! কানাই বলে, "কী করে বুঝলে এত সব?"

মেজ-সর্দার ভ্রূ কুঁচকে বলে, "কে জানে কী করে বুঝলাম! কিন্তু আমার সব মনে পড়ে যাচ্ছে যেন।"

বিড়ি-চোর বলে, "সর্দারের মাথা খুব পরিষ্কার।"

মেজ-সর্দারের পিছু পিছু ডাকাতরা এগোতে লাগল।

ঠিক এই সময়ে একটা বিশাল কালো চেহারা এক তলা থেকে এক লাফে রাজবাড়ির দোতলায় উঠে গেল। দরবার-ঘরের দরজা থেকে একটা টর্চের ঝলকানি এল, সেই সঙ্গে গুড়ুম করে গুলির শব্দ।

গণেশবাবু ভৈরবীতে চমৎকার বিলম্বিত করছিলেন। গুলির শব্দ হতেই তিনি দড়াম করে মেঝেতে পড়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

ভজবাবু খানিকটা হতভম্ব হয়ে রইলেন। ডাকাতদের কারও বন্দুক-পিস্তল নেই, তিনি জানেন। তবে কি পুলিশ? সন্দেহ হতেই ভজবাবু বিপুল বিক্রমে খাঁড়া ঘোরাতে ঘোরাতে বীরদর্পে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

কে যেন সতর্ক গলায় ডাকল, "ছোড়দা।"

আর একজন বলল, "মেজকাকু!"

মেঝে থেকেই বরদাচরণ বললেন, "দোহাই ভজবাবু।"

ভজবাবু একটু থমকে গেলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, "নহি দাদা, নহি আমি কারও মেজকাকু। সম্মুখ-সমরে আত্মীয়তা ঘোর দুর্বলতা। ছাড়ো দ্বার, যাবো অস্ত্রাগারে..."

মেঝে থেকে বরদাচরণ প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন, "ভজবাবু, দোহাই আপনার, শিগগির শুয়ে পড়ুন যদি বাঁচতে চান। একটা লাশ পড়েছে, আপনাকেও গুলি করবে।"

দরজার কাছ থেকে হারাধন বলে ওঠে, "কারও লাশ পড়েনি। গুলি আমি ছাদে চালিয়েছি।"

বরদাচরণ বলেন, "তা হলে গণেশবাবু?"

রাজমাতা ডুকরে উঠে বললেন, "ওরে, আমার গোবিন্দকে তোরা কী করেছিস?"

মেজ-সর্দার গম্ভীর গলায় বলে, "সে ভাববেন না ঠাকুমা, রাজামশাই দাঁড়িয়ে আছেন সামনের দিকের বারান্দায়।"

"আর আমার ঘুঁটে? কাল যে নন্দী-বাড়ির চাকর পাঁচশো ঘুঁটে নিতে আসবে।"

"দেবেন। ঘুঁটে আমরা নিই না। আমরা টাকা সোনা আর দামী জিনিস নেব। আপনারা ঘর ছেড়ে দিন। এখন মেলা কাজ আছে আমাদের। চোর-কুঠুরির গুপ্ত দরজা খুঁজে বের করতে হবে।"

রানী-মা শ্বাস ফেলে বললেন, "সে আর খুঁজতে হবে না বাছা, পূর্ব-দক্ষিণ কোণের ওই খাটটা সরালেই দেখতে পাবে। চোর-কুঠুরির দরজা খোলাই আছে। কিন্তু নেওয়ার কিছু নেই। লাখ লাখ অচল টাকা। যাও নিজেরাই দেখে এসো গে।"

"অচল টাকা?" মেজ-সর্দারের মুখটা খানিকক্ষণ থমথম করে। কী একটু ভাবে সে। তারপর মাথা নেড়ে বলে, "তাই বটে। অচলই হওয়ার কথা। আমি ছেলেবেলায় দেখেছি ওসব টাকা বহুকালের পুরননা। তখনই বোধ হয় বাজারে চলত না। এখন তো আরও চলবে না।"

রানী-মা ভ্রূ কুঁচকে বলেন, "ছেলেবেলায় দেখেছ মানে? তুমি কি বাবা এ-বাড়িতে এসেছ কখনও?"

"মনে হয় যেন এসেছি। সবই চেনা লাগছে।"

রানী-মা উদ্বেল হয়ে বললেন, "তুমি একটু কাছে এসো তো বাবা, তোমার মুখখানা একটু ভাল করে দেখি। ও আমার ডাকাত-ছেলেরা, তোমরা একটু মশালগুলো ভাল করে ধরো তো।"

রাজা গোবিন্দনারায়ণের মূর্ছা হঠাৎ ভাঙল। কারণ, কে যেন তাঁর ঘাড়ে আর মুখে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। মূর্ছা ভেঙে তিনি হাই তুলে পিছু ফিরতেই আবার মূর্ছা গেলেন। এবং দাঁড়িয়ে। তামর কারণ হারাধনের কিম্ভূত এবং অতিকায় গোরিমানটা গোবিন্দনারায়ণকে শুঁকে দেখছিল।

গোবিন্দনারায়ণকে ও রকম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গোরিমানটা বিরক্ত হয়ে তাঁকে ছেড়ে ভিতরবাগে চলল। একটা ছ্যাঁচড়া ডাকাত টুলের ওপর উঠে রাজবাড়ির একটা দেয়াল থেকে পুরনো একটা দেয়ালঘড়ি খুলে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। গোরিমানটা পিছন থেকে গিয়ে টুলটা ধরে অল্প অল্প ঝাঁকাতে লাগল। ডাকাতটা পিছু না ফিরেই বলল, "ঝাঁকাস না বাপ! ঘড়িটা বেচে যা পাব তা দু-জনের ভাগ।"

গোরিমানটা আরও জোরে ঝাঁকায়।

ডাকাতটা পেল্লায় একটা ধমক দিয়ে ভাল করে না-দেখেই পিছনে একটা লাথি চালিয়ে দিল। সে ভেবেছিল তার স্যাঙাতদেরই কেউ হবে।

গোরিমান লাথি খেতে পছন্দ করে না। তাই সে খুব গম্ভীরভাবে টুলটা টেনে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। ডাকাতটা মাটিতে পড়ে পেল্লায় চেঁচাতে থাকে। বিরক্ত গোরিমান তাকে তুলে বগলে থার্মোমিটারের মতো চেপে ধরে চারদিকে ঘুরে দেখতে লাগল।

রাজবাড়ির ফটকে ততক্ষণে পুলিশের গাড়িটাড়ি সব এসে পৌঁছেছে। একটা জিপগাড়ি থেকে অতি সাবধানে নামতে নামতে নিশি দারোগা বললেন, "কালী, কালী। ওরে, তোরা সব সাবধানে চারদিক দেখে-টেখে এগো। আমার আজ শরীরটা ভাল নেই। বড্ড হাই উঠছে।"

সন্ধেবেলা গোরিমানগুলোর হাতে নাকাল হয়ে সেপাইরাও একটু ঠাণ্ডা মেরে গেছে। বন্দুক বা লাঠি হাতে থাকলেও তারা খুব সাহস পাচ্ছে না। একজন সেপাই বলে উঠল, "বড়বাবু, আপনার শরীর খারাপ হলে আমারও খারাপ। পেটটা তখন থেকে বকম বকম করছে।"

আর একজন সেপাই বলে দিল, "আমরা যখন জাম্বুবানের হাতে ধোলাই খেলাম, তখন আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন বড়বাবু। এবার না জানি আবার কার পাল্লায় পড়ি, এবার দয়া করে আপনি আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে থাকুন।"

নিশি দারোগা বললেন, "কালী কালী। চল দেখি।"

বলে খুব অনিচ্ছেয় তিনি টর্চ আর রিভলবার বাগিয়ে সাবধানে রাজবাড়ির ফটক পার হয়ে ঢুকলেন।

ওদিকে রানীমা চার-পাঁচটা মশাল আর সেজবাতির আলোয় মেজ-সর্দারের মুখ দেখছেন। আর মেজ-সর্দার, যার ভয়ে গোটা গঞ্জ কাঁপে, ডাকাতরাও যাকে যমের মতো ডরায়, সেই মহাতেজী মেজ-সর্দার রানী-মার খাটের পাশে মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসে খুব লজ্জা-লজ্জা ভাব করে রানী-মাকে নিজের মুখ দেখতে দিচ্ছে।

এসব ব্যাপারে অধৈর্য হয়ে বিড়ি-চোর চোর কুঠুরিতে যাবে বলে খাটের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছিল, কানাই তার ঠ্যাং ধরে টেনে এনে খুব ঘা-কতক দিয়ে বলল, "সর্দারের হুকুম হয়নি, তার আগেই ঢুকছিলি যে বড়? দেব গর্দান নামিয়ে?"

বিড়ি-চোরও তেড়িয়া হয়ে বলে, "আমিও গর্দান নামাতে জানি।"

দুজনে তুমুল ঝগড়া লেগে পড়ল।

সে গোলমালে অবশ্য রানী-মা বা মেজ-সর্দারের কান নেই। রানী-মা ডাকাতের সর্দারের মাথায় হাত বুলোতেবুলোতে বললেন, "ভাবতেও ভয় করে, যদি সত্যি না হয়। কিন্তু বাবা, তুমি যদি আমার হারানো ছেলে কন্দর্পনারায়ণ হতে!"

রাজমাতাও বললেন, "আহা, যদি আমার নাতি কন্দু এখন ফিরে আসত।"

ঠিক এই সময়ে পিস্তল হাতে হারাধন, খাঁড়া হাতে গোয়েন্দা বরদাচরণ এবং ছবি হাতে মনোজ ঘরে এসে ঢুকল।

বরদাচরণ মননজের হাত থেকে ছোঁ মেরে ছবিটা কেড়ে নিয়ে হাঃ হাঃ অট্টহাসি হেসে বললেন, "মহারানী, হওয়া-হওয়ির কথা আর বলবেন না। আপনার সামনে ওই যে ডাকাত দলের সর্দার বসে আছে, সে-ই হল আপনার হারানো ছেলে কুমার কন্দর্পনারায়ণ। আগে দেখুন এই ছবিটা কুমার কন্দর্পের ছবি কিনা!"

রানী-মা বরদাচরণের মতোই হুবহু ছোঁ মেরে ছবিটা কেড়ে নিয়ে দেখেই বলে উঠলেন, "বলো কী বাবা গোয়েন্দা! এই তো আমার কন্দর্পর ছবি! সেবার আমরা দেওঘরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কন্দর্প দুধের গেলাশ পাশে রেখে ছবি তুলতে বসেছিল, পিছনের ঘরে পদার আড়ালে আমি দাঁড়িয়ে দেখছি। হতচ্ছাড়া বেড়ালটা তখন কোত্থেকে এসে দুধটা খেয়ে যাচ্ছিল...হুবহু সব মনে পড়ে যাচ্ছে যে!"

বরদাচরণ গম্ভীর হয়ে বললেন, "এবার ছবির সঙ্গে ডাকাতের সর্দারকে মিলিয়ে দেখুন।"

রানী-মা মেজ- সর্দারকে কাছে টেনে "ও আমার কন্দু রে" বলে কেঁদে ফেললেন।

মেজ-সর্দার বিড়বিড় করে বলল, "তাই সব এত চেনা-চেনা লাগছিল বটে!"

বরদাচরণ 'হেঃ হেঃ' করে হেসে বললেন, "কত বুদ্ধি খাটিয়ে যে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি তা আর বলার নয়।"

হারাধন ধমক দিয়ে বলে, "বেশি বোকো না। মেজ-সর্দারকে রাজকুমার বলে প্রথম যে চিনতে পারে সে হল আমার ভাইপো মনোজ। "

বরদাচরণ লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ মনোজেরও যথেষ্ট অবদান আছে। এসো মনোজ, এগিয়ে এসো।"

মনোজ এগিয়ে আসে। রানী-মা তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে করতে বলেন, "সবাই শোনো তোমরা, রাত এখন যতই হোক, আমার ঘরে আজ অনেক ঘি আর ময়দা আছে। গতকাল আমাদের একটা তালুক থেকে জিনিসপত্র অনেক এসেছে। আমি এখন সবাইকে লুচি ভেজে খাওয়াব। আমার ডাকাত ছেলেদের কয়েকজন চলো গিয়ে একটু ময়দা মেখে দেবে।"

ডাকাতরা অবস্থা বুঝে যে যার হাতের অস্ত্রশস্ত্র এদিক ওদিক ফেলে দিয়ে ভাল মানুষের মতো ব্যবহার করছিল। মেজ-সর্দার যে রাজকুমার তা জানলে তারা কক্ষনো রাজবাড়িতে ঢুকত না। কানাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, "রাত খুব বেশি হয়নি রানী-মা। মোটে সাড়ে বারোটা, ময়দা মাখতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না।"

ঠিক এই সময় নিশি দারোগা পিছন থেকে বলে উঠলেন, "হ্যান্ডস আপ।"

কেউ হাত তুলল না। হারাধন বলে উঠল, "আহা দারোগাবাবু, এখানে কোনও গণ্ডগোল হচ্ছে না।"

বরদাচরণও বললেন, "একটা হ্যাপি এন্ডিং হচ্ছে নিশিবাবু, এখানে কোনও গণ্ডগোল হচ্ছে না।"

রানী-মা বললেন, "ও বাবা নিশি, লুচি হচ্ছে, সবাই খেয়ে যাবে।" বলে মহারানী চারজন ডাকাতকে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

দারোগাবাবু খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমি সবাইকে হাত তুলতে বলেছি, সেকথা কারও কানে যাচ্ছে না নাকি?"

কিন্তু কেউ নিশিবাবুকে তেমন পাত্তা দিতে চাইছে না। বরদাচরণ তাঁকে বোঝাতে লাগলেন, "আপনার আসবার কোনও দরকারই ছিল না নিশিবাবু, আমি একাই সিচুয়েশনটা সামলে নিয়েছিলাম! হেঃ হেঃ!"

এদিকে রাজামশাইয়ের মূর্ছা আবার ভেঙেছে। ভেঙেছে অন্য কিছুতে নয়, গাওয়া ঘিয়ে লুচি ভাজার গন্ধে। শিউরে উঠে তিনি আপন মনে বললেন, "আবার গাওয়া ঘিয়ের লুচি?"

রাজবাড়ির পুরনো চাকর দৌড়ে এসে খবর দিল, "রাজামশাই, কুমার কন্দর্পনারায়ণ ফিরে এসেছেন। শিগগির যান, রান্নাঘরে রানী-মার কোল ঘেঁষে বসে কেমন লুচি খাচ্ছেন দেখুন গে।"

রাজা গোবিন্দনারায়ণ খানিকটা হতভম্ব থেকে তারপর তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে এগোলেন।